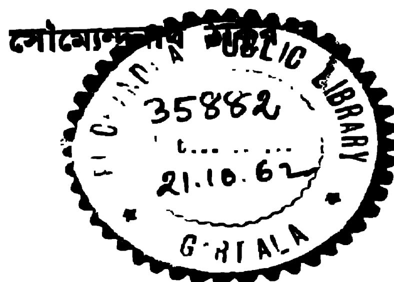
কালিদাসের কাব্যে ফুল

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর



বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শঙ্কর ঘোষ লেন
কলিকাতা—৬

প্রকাশক :

জানকীনাথ বসু

বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড

১, শঙ্কর ঘোষ লেন

কলিকাতা—৬

মূল্য—চার টাকা।

মুদ্রাকর :

প্রভাতচন্দ্র চৌধুরী

লোক-সেবক প্রেস

৮৬-এ, লোয়ার সারকুলার রোড

কলিকাতা—১৪

প্রস্তাবনা

কিশোর বয়সে যখন সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করিতাম তখন কেন জানি না কুমারসম্ভবের নিম্নোক্ত শ্লোকটি বার বার আবৃত্তি করিতে বড় ভাল লাগিত :

অশোকনির্ভর্ৎসিত পদ্মরাগমাকৃষ্টহেমদ্যুতি কর্ণিকারম্।

মুক্তাকলাপীকৃতসিন্দুবারং বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী॥

আজও পরিণত বয়সে মাঝে মাঝে ঐ শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া বড় আনন্দ পাই। মদনভস্মের প্রাক্কালে লজ্জাবনতা উমাকে মহাকবি যে অপরূপ সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছেন—যাহার সুযোগ করিয়া অনঙ্গ তাহার অমোঘ অস্ত্র ধনুতে সংযোজন করিয়াছিল—না জানি, সে অনুপম রস-সৃষ্টিতে মহাকবির কি অনির্বচনীয় কুশলতাই না অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই রূপ-সৃষ্টিতে বিলাসবৈভব নাই, আছে সুষমা। মহাকবি উমাকে পুষ্পাভরণে সাজাইয়াছেন—কিন্তু এ আভরণ অন্যান্য লোকপ্রসিদ্ধ আভরণের ন্যায় অলংকারের উৎকর্ষসাধন করে না। এ আভরণ আহার্য অথবা কৃত্রিম শোভার জনক নয়। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে আভরণহীন রূপের বর্ণনায় কবিচিত্ত বহুস্থলে পর্যাপ্ত তৃপ্তি অনুভব করিয়াছে সত্য, কিন্তু পুষ্পাভরণভূষিতা তপস্বিণীর রূপশ্রী বর্ণনায় মহাকবি যখন তাঁহার প্রতিভা-ভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিয়াছেন, তখন যেন মনে হয় যে মহাকবির ভাব-দৃষ্টিতে এই পুষ্পাভরণ অলংকার নহে। যে লাবণ্য স্বতঃই উদ্ভাসিত তাহাত অলংকার নিরপেক্ষ। কবি অন্যত্র বলিয়াছেন যে, নিসর্গ-সুন্দর রূপ অলঙ্কার যোজনায় বিকৃত হয়। কিন্তু পুষ্পাভরণে ভূষিত করিয়া কবি নিশ্চয়ই উমার রূপলাবণ্যকে মলিন করেন নাই—এ আভরণ উমার স্বরূপ-সৌন্দর্যেরই জীবাতুভূত—ইহা তাহার রূপোৎকর্ষপরিবাহী নহে।

সত্য সত্যই প্রকৃতির রাজ্যে ফুল এক অপরূপ সৃষ্টি। কেবল বর্ণবৈচিত্র্যে নয়, কেবল গন্ধমাধুর্যে নয়—ফুলের আকর্ষণ মানুষের কাছে চিরন্তন। ভক্ত ভগবানের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, শ্রদ্ধা-প্রীতিভরে মানুষ প্রিয়জনের উদ্দেশে ফুল অর্পণ করে। কারণ ইহার শুচি-শুভ্রতায় মানুষ আপন স্বরূপেরই সাজাত্য অনুভব করে। কবির রস-দৃষ্টিতে ফুলের এই মহিমময় লাবণ্য ধরা পড়িয়াছে—তাই তাঁহার দৃষ্টিবৈচিত্র্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সাম্য ও সাজাত্য। এ দুয়ের মধ্যে একটা নিবিড় অন্তরঙ্গতা আছে। তাই মাধবীলতার নব-পুষ্পোদ্গমে শকুন্তলা উৎসব-আনন্দ অনুভব করে—সে যে প্রকৃতি-দুহিতা। এত সহজ ও ললিতভাবে কবি ফুলের সঙ্গে মানুষের এই আত্মীয়তার কথা উল্লেখ করেন যে, সহৃদয়চিত্তে কোনও সন্দেহ জাগে না যে কবি কোন নিসর্গবিরোধী ঘটনার অবতারণা করিতেছেন। তাই পুষ্প-

শ্রীমণ্ডিত রমণীর রূপে কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই—আছে স্বভাবসিদ্ধ লালিত্য ও সুষমা।

মহাকবি ফুলকে ভালবাসিয়াছেন। কতকগুলি ফুলকে তিনি আপন হৃদয়-করণ্ডকে স্থান দিয়াছেন। একথা সত্য যে সকল-ফুল তাঁহার চিত্তভূমিকে অধিকার করিতে পারে নাই—কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই—অনেক নাম-না-জানা ফুল কবিমানসকে ভাবরসে সিঞ্চিত করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহাতে অগৌরবের কিছু নাই—ইহাতে কবির ভাবপ্রবণ দরদী মনের কোনও কৃপণতা বা ন্যূনতা প্রমাণিত হয় না। প্রত্যুত তাঁহার কাব্যের এক শুদ্ধ আভিজাত্য অভিব্যক্ত হয়। এক অপরূপ শুচিতা ও সংযম তাঁহার কাব্যকে রসসমৃদ্ধ করিয়াছে, যাহাতে মনে হয় কবি যেন তাঁহার নিজের জগতেই বিচরণ করিতেছেন। কবির উদগ্র রস-দৃষ্টি কয়েকটি বিশিষ্ট ফুলের উপরেই নিবদ্ধ। এমন অনেক কবি আছেন যাঁহারা প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু রুক্ষ অথবা ভীষণ, যাহা কিছু বিরস অথবা বীভৎস তাহাকে রূপায়িত করিতে ভালবাসেন—নিশীথ রাত্রিতে স্তব্ধ শ্মশানের ভয়ংকর রূপ ভবভূতির ভাবলোকে স্থান পায়। কিন্তু মহাকবি কালিদাসের কবিমানস ভিন্ন পর্যায়ের। প্রকৃতির মাঝে যাহা কিছু কোমল ও যাহা কিছু স্নিগ্ধ, যাহা কিছু মধুর ও যাহা কিছু ললিত তাহারই বর্ণনায় তাঁহার কণ্ঠ মুখর। ইহা কবি-দৃষ্টিরই বৈচিত্র্য। ঠিক্ তেমনই কোন কবির কাব্যকরণ্ডকে পথপ্রান্তের অনাদৃত ফুলের দল সঞ্চিত হইয়াছে, কবি তাহাদের সকলকেই কাব্যরসে সিঞ্চিত করিয়াছেন—আবার এমন অনেক কবিও আছেন যাঁহাদের রস-দৃষ্টি ও আভিজাত্য-বোধ মাত্র কয়েকটি গরবী ফুলকেই চয়ন করিয়াছে। কালিদাস এই শেষ পর্যায়ের কবি। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি কবিমানসের কোনও ন্যূনতার পরিচায়ক নহে। ইহা কবি-দৃষ্টিরই প্রাতিস্বিক বৈচিত্র্য ও নিরঙ্কুশত্ব।

কালিদাসের বিভিন্ন কাব্যে যে সকল ফুলের বর্ণনা আছে শ্রদ্ধাভাজন সৌম্যেন্দ্র-নাথ এই গ্রন্থে সেগুলিকে নিপুণভাবে চয়ন করিয়াছেন। কিন্তু পুষ্পচয়নই তাঁহার একমাত্র কৃতিত্ব নহে। যে যে শ্লোকে ফুলের কথা বলা হইয়াছে সেই মূল শ্লোক-গুলিকে তিনি বাংলায় অনুবাদও করিয়াছেন। এই অনুবাদ-পাঠে মনে হয় যে লেখক শুধু নিপুণ অনুবাদকই নহেন—তিনি নিজেও কবিধর্মাক্রান্ত। আমি বিশ্বাস করি এই নাতিদীর্ঘ গ্রন্থখানি বাঙ্‌লাভাষার সম্পদ্‌রূপে সুধীসমাজে আদৃত হইবে।

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

কালিদাসের কাব্যে ফুল

কবির প্রকাশ কাব্যে, কেন না কবির অন্তরের সমস্ত ঐশ্বর্য ধরা পড়ে শুধু কবির কাব্যে, তাঁর সৃষ্টিতে। মানুষের আসল পরিচয় যখন তার অন্তরের ঐশ্বর্যের পরিচয়ে তখন কবির সৃষ্টিই কবিকে জানবার ও বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট। তবুও মানুষ আরো জানতে চায়, নানা দিক থেকে নানা ভাবে জানতে চায়, তার জানার ও কাছে পাওয়ার তৃষ্ণার শেষ নেই। বিশেষ করে যাকে ভালবাসে, যাকে মন চায় তাকে মানুষ নিঃশেষ করে জানতে চায়। তার সম্বন্ধে মানুষের মনে কৌতূহলের শেষ নেই। প্রেম এমনি করেই বিস্ময়ের কাজল পরিয়ে দেয় মানুষের মানসনেত্রে। তাই কবির সম্বন্ধে মানুষের এতো কৌতূহল, কবিকে সবদিক থেকে জানবার জন্যে তার অন্তরের এমন রস-পিপাসা। কাব্য এমনি আনন্দ-ধারায় মনকে সিক্ত করে, যে তাতে মন সরস হয়ে সব কিছু অনুভব করবার জন্যে তৃষিত হয়ে ওঠে। এমনি আলো জেবলে দেয় কাব্য অন্তরের দীপে যে সে আলোতে বিশ্বের সব কিছুকে তাদের স্ব-রূপে জানবার জন্যে মন সহস্র শিখা মেলে ধেয়ে চলে। যে স্রষ্টা, যে কবি তাঁর সৃষ্টির অগ্নি-পরশে মানুষের চেতনাকে এমনি করে পূর্ণজাগ্রত করেন তাঁর পানে ভালোবাসা যে ধেয়ে যাবে শত তরঙ্গে, তাঁকে সব দিক থেকে জানতে, অনুভব করতে যে চেষ্টা করবে মানুষ, এতো স্বাভাবিক। তাই কবিদের সম্বন্ধে মানুষের যতো কৌতূহল এমন কৌতূহল আর কারো সম্বন্ধে নেই। কবি হচ্ছেন মানুষের সব চেয়ে প্রিয়, ভালোবাসার ধন।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন মহাকবি কালিদাস। যুগের পর যুগ চলে গেছে, তাঁর কাব্যের সুধা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমরা পান করে চলেছি, তবুও আজো তা এতোটুকুও পান্‌সে, কিম্বা রসহীন বলে মনে হয় না। সমকালীন রোয়াকি-সাহিত্যের মৌসুমের যুগে, আজও কালিদাসের কাব্য অমৃত-নির্ঝর হয়ে রয়েছে রসিকের কাছে। মোটা সুর, বেসুরো সুর যে নেই তাঁর কাব্যে তা বল্‌ছি নে, নিশ্চয়ই আছে, যেমন তাঁর 'ঋতুসংহার' কাব্যে; কিন্তু পেলব সুর, গভীর অনুভূতির অনুপম রূপ-সৃষ্টিও এতো আছে তাঁর কাব্যে যে তাঁর মতো মহাকবির এই রস-বিকৃতির ও রুচির স্থূলতার অপরাধ আমরা গভীর রসাস্বাদনের আনন্দে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ক্ষমা করতে পারি।

কালিদাসের কাব্যের মধ্যে দিয়ে তাঁর কালের সামাজিক অবস্থার ছবি আমরা পাই। তা'ছাড়া ভারতবর্ষের কোন কোন অংশের সঙ্গে মহাকবির পরিচিতি ছিলো সেটাও আমরা জানতে পারি। কিন্তু এই পৃথিবীতে তাঁর আসা-যাওয়ার সময়ের সব প্রমাণ মহাকাল যেন ইচ্ছে করে গোপন করে নিয়েছেন। যিনি মৃত্যুঞ্জয়ী কবি তাঁর

জন্ম-মৃত্যুর তারিখ ও সনের হিসেব রেখে লাভ কি?—মহাকাল যেন এই কথাই আমাদের বল্‌তে চান। কিন্তু কোন্ শতাব্দীতে কালিদাস জন্মেছিলেন সে সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকে কালিদাসের আবির্ভাব। আবার কারো কারো মতে সপ্তম খৃষ্টাব্দে কালিদাস আবির্ভূত হয়েছিলেন। খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকে কালিদাসের আবির্ভাব এই মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁরা 'মালবিকাগ্নিমিত্র'-এর নজির দিয়ে বলেন যে সুংগ বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্রের ছেলে অগ্নিমিত্রের রাজদরবারের জীবনের বর্ণনা রয়েছে এই কাব্যে। এই অগ্নিমিত্র খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকের শেষ ভাগের লোক। আবার যে ঐতিহাসিকেরা সপ্তম খৃষ্টাব্দে কালিদাসের জন্ম এই মত পোষণ করেন তাঁরা রবিকীর্তির আইহোল শিলা-লিপির লিখনের উল্লেখ করে তাঁদের মতের যথার্থতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন।

দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর জেলার বর্তমান 'আয়াভেল'-ই হচ্ছে প্রাচীন যুগের আইহোল। রাজা দ্বিতীয় পুলিকেশীর রাজত্বকালে ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে আইহোল-এ একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই মন্দিরে এই শিলা-লিপি আছে—"কালিদাস ও ভারবির তুল্য যশের অধিকারী রবিকীর্তির জয় হোক।"

খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকে কালিদাসের জন্ম এই মতের বিপক্ষে যে ইতিহাসবিদ পণ্ডিতেরা তাঁরা নিম্নলিখিত এই যুক্তিগুলি দেখিয়েছেন।

প্রথমত, কালিদাস যে পাতঞ্জলির 'যোগসূত্র' ভালো করে জানতেন তার প্রমাণ তাঁর রচনা থেকে আমরা পাই। পাতঞ্জলি ছিলেন পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক।

দ্বিতীয়ত, বহু যুগ থেকে চলে-আসা জনশ্রুতি অনুসারে কালিদাস ছিলেন বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক। সুংগ কুলের রাজারা কিন্তু বিক্রমাদিত্য উপাধি কখনো ব্যবহার করেন নি। তা'ছাড়া খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম শতকে বিক্রমসম্বৎ সুরু হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম শতকে বিক্রমাদিত্য নামে কোনো রাজা শকদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে শকারি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন ও বিক্রমসম্বৎ সুরু করেছিলেন, এমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ আমরা পাই না। তা'ছাড়া যে শতাব্দীতে বিক্রমসম্বতের সুরু হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে, তার প্রায় এক হাজার বছর পরে এই সম্বতের প্রথম চলন হয়।

তৃতীয়ত, অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে কালিদাস অশ্বঘোষেরও আগে। তাঁর যুক্তির সার কথা হচ্ছে এই যে কালিদাস আর অশ্বঘোষ দুজনেই তাঁদের রচনায় এক ধরনের শব্দবিন্যাস ব্যবহার করেছেন। অশ্বঘোষ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক। অতএব কালিদাস নিশ্চয়ই খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম শতকের লোক। কিন্তু শ্রী উপাধ্যায় তাঁর 'India in Kalidas' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে

কালিদাস ও অশ্বঘোষের কাব্যে শব্দ-বিন্যাসের যে সাদৃশ্য অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আবিষ্কার করেছেন, সেই শব্দ-বিন্যাসগুলি প্রায় অধিকাংশ সংস্কৃত কবিরা ব্যবহার করেছেন।

চতুর্থত, কালিদাসের রচনায় কোথাও শকদের সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই। যদি তিনি খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম শতকের লোক হতেন তা'হলে 'গার্গী সংহিতা'-র যুগ-পুরাণ অংশে শকদের অভিযান সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে তা নিশ্চয়ই জানতেন। এই সংহিতা আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব ৩৫ সালে রচিত হয়।

পঞ্চমত, কালিদাসের রচনায় যে ভারতবর্ষের ছবি আমরা পাই সে ভারত ঐশ্বর্যশালী ও শান্তিময়। খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম শতকের অশান্তি ও অভিযানের ঝড়ের ঝাপ্‌টা-খাওয়া ভারতবর্ষের ছবি আমরা তাঁর রচনায় পাই না।

ষষ্ঠত, পৌরাণিক সংস্কারের উল্লেখ কালিদাসের রচনায় আমরা বার বার পাই। এই পৌরাণিক সংস্কারগুলি কিন্তু গুপ্তবংশীয় রাজাদের শাসনকালে তাঁদের আনুকুল্যে সংগৃহীত হয়।

সপ্তমত, কালিদাস বহু হিন্দুদেবদেবীর উল্লেখ করেছেন তাঁর রচনাগুলিতে। এগুলি কিন্তু খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম শতকের সৃষ্টি নয়। মহাযান বৌদ্ধ মতবাদের প্রবর্তনের পরে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভক্তি-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। তখন থেকেই এই নানা দেবদেবীর সৃষ্টি ঘট্‌তে থাকে। তার আগে প্রধানত যক্ষমূর্তির পূজা হোতো। এই প্রসঙ্গে এটাও লক্ষ্য করা ভালো যে কালিদাসের রচনায় দেবদেবীর যতো উল্লেখ আছে, তার চেয়ে দেবদেবীর অনেক কম উল্লেখ আছে অশ্বঘোষের রচনায়। এর থেকে এও অনুমান করা যায় যে কালিদাস অশ্বঘোষের পরের যুগের লোক। প্রথম খৃষ্টাব্দে এসেছিলেন অশ্বঘোষ।

যাঁরা কালিদাসকে সপ্তম খৃষ্টাব্দের লোক বলে প্রমাণ করতে চান তাঁদের যুক্তির বিরুদ্ধে শ্রী উপাধ্যায় বলেন যে হূনদের ভারতে প্রবেশ ও ভারতে বাস সম্বন্ধে কালিদাস যে কিছু জানতেন তার প্রমাণ তাঁর রচনায় নেই। আর হূনেরা ৪২৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে বসবাস করেছিলেন। তাঁর সময়ের অনেক আগে হূনদের ভারতে আগমন হলে কালিদাস নিশ্চয়ই সেটা জানতেন ও তার উল্লেখও করতেন তাঁর রচনায়।

এম্‌নি করে ঐতিহাসিক যুক্তি দিয়ে বিরাট কালের বুকে রেখা টান্‌তে টান্‌তে আমরা চতুর্থ খৃষ্টাব্দকে কালিদাসের আবির্ভাবের যুগ বলে নির্ণয় করি। আর একটি বিষয়ও এই কাল নির্ণয়ে আমাদের সাহায্য করেছে। বাৎসায়নের মত যে কালিদাস অনুসরণ করেছেন তার বহু প্রমাণ কালিদাসের কাব্যে আছে। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে কালিদাস বাৎসায়নের পরের যুগের লোক। আর তৃতীয় খৃষ্টাব্দে বাৎসায়নের আবির্ভাব।

কালিদাস যে গুপ্তযুগের কবি এই মতের সমর্থনে শ্রী উপাধ্যায় যে যুক্তিগুলি

দর্শিয়েছেন সেগুলি প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে—কালিদাস যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তাঁর কাব্যে ও নাটকে, তার সঙ্গে গুপ্ত নৃপতিদের শিলালিপিতে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তার একান্ত সাদৃশ্য।

গুপ্ত নৃপতিদের শিলালিপিতে ধর্ম সম্বন্ধে সহনশীলতার যে পরিচয় পাই, কালিদাসের রচনাতেও তার প্রচুর আভাস আছে। জনশ্রুতি কালিদাসকে বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক বলে ঘোষণা করেছে বহু শতাব্দী ধরে। তৃতীয় খৃষ্টাব্দের পরে আমরা শুধু একজন বিক্রমাদিত্যের হদিশ পাই। তিনি হচ্ছেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। যমিত্র, ডায়মেত্রন্‌ প্রভৃতি গ্রীক শব্দ কালিদাস জানতেন। এই বিদেশী শব্দগুলি ছড়িয়ে পড়তে ও প্রচলিত হতে যে অনেক দিন লেগেছে তা নিঃসন্দেহ। এর থেকেও কালিদাসকে গুপ্ত যুগের লোক বলে অনুমান করা যায়। ভরতের "জালগ্রথীতাঙগুলি কর"—এর বর্ণনা করেছেন কালিদাস। এই ধরণের যুক্তাঙগুলি-সমন্বিত মূর্তি অতি বিরল। আর যে ক'টি এই ধরণের মূর্তি পাওয়া গেছে সব ক'টি হচ্ছে গুপ্ত যুগের। কালিদাস গঙ্গা যমুনার মূর্তির বর্ণনা করেছেন। দেবতাদের চামরধারিণী রূপে এই নদী-দেবী দুটির যে রূপ-কল্পনা তা আমরা শুধু কুশানযুগের শেষ সময়ে ও গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যের প্রারম্ভকালে দেখতে পাই। প্রাক্‌-কুশান যুগের মূর্তি-গুলিতে যে ছত্রের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই, পরবর্তীকালে সেই ছত্রই মূর্তির মাথার পিছনের 'প্রভামণ্ডল'-এর রূপ নেয়। কুশানযুগে এই প্রভামণ্ডল সাদাসিধে গোলাকৃতি রূপে কল্পিত ছিলো। পরবর্তী গুপ্তযুগে এই প্রভামণ্ডলের ভিতরটা নানা কাল্পনিক মূর্তি ও আলোর রশ্মির রূপ-রেখা দিয়ে ভরে তোলা হয়। কালিদাস যে এটা ভালো করে জানতেন তার প্রমাণ পাই আমরা তাঁর রঘুবংশ কাব্যে যেখানে তিনি 'স্ফুরৎপ্রভামণ্ডল' এই শব্দ ব্যবহার করেছেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কালিদাসের আবির্ভাব, এই মতের সমর্থনে শ্রী উপাধ্যায় উপরি-উক্ত যুক্তিগুলির অবতারণা করেছেন। শ্রীশিবদাস মূর্তি তাঁর **'Epigraphical Echoes of Kalidasa'** বইটিতে কালিদাস চতুর্থ খৃষ্টাব্দের লোক এই মতের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তি দেখিয়েছেন।

কালিদাস যে 'ঋতুসংহার' ও 'মেঘদূত' কাব্য দুটি ৪৭৩-৪৭৪ খৃষ্টাব্দের (৫২৯ বিক্রম সম্বৎ কিম্বা মালব্য সম্বৎ) পূর্বে রচনা করেছিলেন তার প্রমাণস্বরূপ শ্রীশিব-মূর্তি একটি শিলালিপির উল্লেখ করেছেন। এই শিলালিপিটি দশপুরের তন্তুবায়দের নির্দেশে কবি বৎসভট্টি কর্তৃক রচিত। উজ্জয়িনী থেকে আশী মাইল উত্তর-পশ্চিমে দশপুর নগরী অবস্থিত। দশপুরে যে সব তন্তুবায়েরা রেশমী বস্ত্র তৈরী করার জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো, সেই তন্তুবায়দের শ্রেণী-সংস্থার (guild) নির্দেশে বৎসভট্টি নামক এক কবি দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের রাজত্বকালে (৪৬৯-৪৭৬ খৃঃ) এই শিলালিপিতে যে কবিতাটি খোদিত আছে সেটি রচনা করেন। মধ্য ও দক্ষিণ

গুজরাট থেকে এই তন্তুবায়েরা দশপুরে আসে রাজা বন্ধুবর্মনের রাজত্বকালে। ৪৩৭ খৃষ্টাব্দে এই তন্তুবায়েরা দশপুরে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। ৪৭৩ খৃষ্টাব্দে তারাই এই মন্দিরটির সংস্কার করায়। এই ঘটনা দুটিকে স্মরণীয় করবার জন্যে তন্তুবায়েরা কবি বৎসভট্টিকে দিয়ে একটি কবিতা রচনা করায় শিলালিপিতে খোদিত করাবার উদ্দেশ্যে। চোয়াল্লিশ স্তবকের এই কবিতাটি কাব্যরীতি অনুসারে লিখিত। কবিতাটি পাঠ করলেই বোঝা যায় যে কালিদাসের কাব্যগুলি বৎসভট্টি যে শুধু জানতেন তা নয়, কেমন করে অন্য কবির কাব্য নিজের কাজে লাগানো যায় সে বিষয়েও তিনি কম নিপুণ ছিলেন না। এ হেন বৎসভট্টির কিন্তু আর যাই দোষ থাক বিনয়ের অভাব ছিলো না; তাঁর এই কবিতার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—"ইয়ম্ প্রযত্নেন রচিতা বৎসভট্টিনা" অর্থাৎ এই কবিতাটি তাঁকে লিখতে হয়েছে অনেক কষ্ট করে।

নানা ধরণের এই সব ঐতিহাসিক তথ্য বিচার করে অনেকটা নিশ্চয়তার সংগে চতুর্থ খৃষ্টাব্দকে কালিদাসের আবির্ভাবের কাল বলে ধরা যেতে পারে।

৩৮০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৪১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত আর তিনি বিক্রমাদিত্য এই উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষ সময়ে ও তাঁর পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে উজ্জয়িনীর কবি কালিদাস ভারতবর্ষের কাব্য-জগৎ আলো করেছিলেন। চতুর্থ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ ও পঞ্চম খৃষ্টাব্দের প্রথম অর্ধাংশ—এই স্বল্প কালটুকুই মহাকবি কালিদাসের জন্ম-মৃত্যুর রেখাঙ্কিত।

কৌতূহল জাগে মনে—উজ্জয়িনীর কবি আমাদের এই ভারতবর্ষের কতোখানি বা কতোটুকু জানতেন! বিরাট, বিশাল এই ভারতবর্ষ তখন ছোটো-বড়ো অগুন্তি রাজ্যে খণ্ডিত ও বিভক্ত। রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ তো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো লেগেই ছিলো, তা'ছাড়া দেশভ্রমণ সেকালে সহজ ছিলো বলে তো মনে হয় না। পথ তখন হাতছানি দিয়ে ইসারা করতো না পথিককে দিগন্তের পানে। অবিশ্যি পথ না চলেও অতীতের মঞ্জুষা থেকে বহু দুঃসাহসিক পথিকদের, বিশেষ করে সন্ন্যাসীদের ও ভিক্ষুদের অভিজ্ঞতা নিজের করে নেবার সুযোগ তখন ঘটে গেছে। পৌরাণিক যুগ ও বৌদ্ধযুগ এই দুই বিরাট যুগের, বিশেষ করে বৌদ্ধযুগের জ্ঞান ও মুক্তির স্রোত তখন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের উপর দিয়ে প্রবাহিত তো হয়েছেই, ভারতের সীমা অতিক্রম করে সিংহল, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বন্ধ্যা মানসভূমিকে সরস করে আশ্চর্য ফসল ফলিয়েছে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের প্রায় ন'শ বছর পরে কালিদাসের জন্ম। তাই পুরাণ ও বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে ভারতের ভৌগোলিক রূপের ধারণা করা কালিদাসের পক্ষে আদপেই দুঃসাধ্য ছিলো না।

কালিদাসের কাব্য ও নাটক পাঠ করে সে-কালের ভারতবর্ষের যে ছবি আমরা

পাই সেটি হচ্ছে এই ঃ দেবতাত্মা পর্বতরাজ হিমালয় রয়েছেন উত্তরে। কালিদাসের কাব্যে এই পর্বতকে কোথাও হিমালয়, কোথাও বা হিমাদ্রি বলা হয়েছে। মানস সরোবরের খবর মহাকবি জানেন। মানস-সরোবর থেকে আনুমাণিক পঁচিশ মাইল দূরে যে কৈলাস পর্বত রয়েছে তাও কবির অজানা নয়। হেমকূট ও কুবেরশৈল কৈলাসেরই অন্য দুটি নাম। মন্দার পর্বত কৈলাসের কাছাকাছি তারও উল্লেখ পাই কালিদাসের কাব্যে। সুমেরু পর্বতের উল্লেখ আছে কালিদাসের রচনায়। একালের কেদারনাথ পর্বতই হচ্ছে সেকালের মেরু অথবা সুমেরু। বিন্ধ্যপর্বত, রেবানদীর উৎপত্তিস্থল অমরকূট পর্বত, একালের অমরকণ্টক, চিত্রকূট পর্বত, বর্তমান বুন্দেলখণ্ডের কান্তনাথগিরি, রামগিরি (বর্তমান রামটক পাহাড়, নাগপুর থেকে চব্বিশ মাইল উত্তরে) ও মহেন্দ্র পর্বত (উড়িষ্যা থেকে মাদুরা পর্যন্ত বিস্তৃত গিরিশ্রেণী)—এই সব পর্বতেরা স্থান পেয়েছে মহাকবির কাব্যে। নদীরাও কাব্যে উপেক্ষিতা নয়। মালিনী, (বর্তমান নাম চুকা। সাহারাণপুর ও অযোধ্যা জেলা দুটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত) তমসা (সরযূর শাখা, বর্তমান নাম তন্‌স্), কপিশা (মেদিনীপুর কাসাই নদী), রেবা (বর্তমান কালের নর্মদা) ও বরদা (মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্ধা নদী)—এই নদীগুলি বাস্তবলোক থেকে রূপের অমৃতলোকে চিরন্তনী হয়েছে মহাকবির কৃপায়।

পশ্চিমে সিন্ধু নদী ধেয়ে চলেছে আরব্য সাগরের দিকে। পূর্বে চলেছে গঙ্গা পূর্ব সাগরের (বর্তমান বঙ্গোপসাগর) পানে। মাঝপথে যে লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) এসে মিশেছে গঙ্গার সঙ্গে তাও কবির অজানা নয়। তাল, ইক্ষু ও ধান অপর্যাপ্ত পরিমাণে বাংলা দেশে হয়, জাফরান ও আঙ্গুর হয় পাঞ্জাবে, মাদ্রাজ অঞ্চলে সুপুরি ও নারকেল গাছ সমুদ্রের তীর ছেয়ে জন্মায়, রেবা নদীর তীর পুন্নাগ ও কেতকীতে ছয়লাপ—এ সব বর্ণনা রয়েছে কালিদাসের কাব্যে। হিমালয়ের পাদদেশে সিংহের বাসভূমি, দেবদারু, ভূর্জ, সরল ও নমেরু গাছের ঘন অরণ্য, সেখানে মৃগেরা বনের বাতাসকে মন্থর করে কস্তুরী গন্ধে, আসামের অরণ্যে বিশালকায় হাতীদের বাস—এ সব কালিদাস তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন।

শিপ্রার তীরে উজ্জয়িনী নগরী, সেখানে মহাকালের মন্দিরে প্রতি সন্ধ্যায় আরতি হয়। বেত্রবতী নদীর তীরে বিদিশানগরী (বর্তমানকালের ভিল্‌সা। ভোপাল থেকে পঞ্চাশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে) কেয়া ফুল, জম্বু বৃক্ষ ও মানস-যাত্রী মরাল—এই ত্রয়ী শোভার আকর। মেঘদূত-এ মেঘের আকাশ-পাড়ি দেবার ছবি কবি এঁকেছেন—বিদিশার নিকটেই নীচ পাহাড় কদম ফুলে আলো হয়ে আছে। তার কিছু দূরে নির্বিন্ধ্যা (বর্তমানের নেওয়াজ নদী) নদী যা পার হয়ে উজ্জয়িনীতে যাবার জন্যে যক্ষ মেঘকে অনুরোধ করেছেন। উজ্জয়িনীতে কিছুকাল বিশ্রাম করে পথ-শ্রান্তি দূর করে চর্মন্বতী নদী (বর্তমানের চম্বল নদী) পার হয়ে দশপুর হয়ে মেঘ যাবে

'ব্রহ্মাবর্ত'-এ। ব্রহ্মাবর্ত হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাব। 'ব্রহ্মাবর্ত' থেকে কুরুক্ষেত্র হয়ে কন্‌খল্ পর্বতের দিকে মেঘকে যেতে নির্দেশ দিচ্ছেন যক্ষ। সেখান থেকে মানস-সরোবর হয়ে মেঘ যাবে কৈলাস—সেখানে অলকা।

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সব অংশের খবরই কালিদাস মোটামুটি জানতেন, যদিও তাঁর কাব্যে হিমালয় ও মালব্যের বর্ণনাই সব চেয়ে বেশী করে আছে। কবির প্রিয় উজ্জয়িনী এই মালব্য প্রদেশে। তাই মালব্য প্রদেশের ফুল, গাছ, নদী, পাহাড় ফিরে ফিরে দেখা দিয়েছে তাঁর কাব্যে। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে 'ঋতু সংহার' কাব্যে কালিদাস যে ছয় ঋতুর বর্ণনা করেছেন সে ঋতুগুলি মালব্য প্রদেশেই আছে, ভারতবর্ষের অন্য কোনখানে নেই। তা ছাড়া যে সব গাছ, ফল ও জন্তুদের বর্ণনা করেছেন কালিদাস 'ঋতু-সংহার'-এ, সেগুলি শুধু মালব্য প্রদেশেই দেখা যায়। তাই স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে কালিদাস ছিলেন মধ্যভারতের মালবপ্রদেশবাসী।

যে সব গাছের কথা কালিদাসের রচনায় পাই, যেমন দেবদারু, সরল, ভূর্জ, চৈত্য, উদুম্বর, নমেরু, সর্জ, আম্র, জম্বুক, মধুক, সপ্তভেদ, করঞ্জ, অর্জুন, মল্লকী, সিন্ধুবার, বন্ধুক, কর্ণিকার, কোবিদার, কল্পদ্রুম, পারিজাত, মন্দার, কুসুম্ভ; কন্দলী, চন্দন, জবা, স্থলকমলিনী, নিচুল, বেতস, ভদ্রমুস্ত, পুগ ও তমাল, সেগুলি হচ্ছে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের গাছ।

এদের মধ্যে দেবদারু ও সরল হচ্ছে হিমালয়ের দু'জাতের পাইন গাছ। নমেরু গাছটিকেও কালিদাস হিমালয়ের বাসিন্দে করেছেন। সর্জ হচ্ছে শাল গাছ। অযোধ্যা থেকে হিমালয়ে বশিষ্ঠ-আশ্রমে যাবার পথে দু'ধারে শালগাছের বন। মধুক হচ্ছে এ কালের মহুয়া। নর্মদার তীরে বহু দূরে পর্যন্ত অসংখ্য করঞ্জগাছ। খান্দেশের গাছ হোলো সল্লকী। পারিজাত, কল্পদ্রুম ও মন্দার, এই তিনটি হচ্ছে কবির কল্পনার গাছ—স্বর্গের গাছ। নিচুল, বেতস ও বাণীর এগুলি নানা জাতের বেত-গাছ, রাজগিরি পর্বতের আশে-পাশে এদের জন্ম। ভদ্রমুস্ত হচ্ছে কাশ। পুগ, তমাল ও চন্দন এগুলি হচ্ছে মলয়স্থলীর গাছ। মালব্যের গাছ জম্বু হচ্ছে আমাদের জাম গাছ। নর্মদা নদী এই জম্বু গাছের ঘন সারির মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। উদুম্বর হচ্ছে এক ধরণের ডুমুর গাছ। উজ্জয়িনী ও চর্মন্বতী নদীর মাঝখানে যে দেবীগিরি পাহাড়, সেই পাহাড় ছেয়ে আছে এই গাছে। আম্রকূট পাহাড়ে আম গাছের কুঞ্জ; আমের বোলের গন্ধে বাতাস বিহ্বল।

ভারতবর্ষের গাছ, নদী, পাহাড় এমনি করে আত্মসমর্পণ করেছে কবির কল্পনার কাছে, নিজেদের স্থান করে নিয়েছে তাঁর কাব্যে। এবারে আমরা চলবো ফুলের সন্ধানে। যে অসংখ্য ফুল ফুটেছিল পথের ধারে, কাননে, নদীর তীরে, পর্বতের সানুদেশে ও অরণ্যে সেই অতীতের ভারতবর্ষে, তাদের সকলের খোঁজে

আমরা যাচ্ছি না। কি লাভ তাদের থেকে যদি তারা কবির হৃদয় জয় করতে না পারলো! তারা সেদিন থেকেও, ছিলো না, কেন না তারা মহাকবির মনোহরণ করতে পারে নি। যে ফুলগুলি কবির কল্পনার রঙে রঙীন হয়ে, তাঁর ভাবরসের শিশিরে সিক্ত হয়ে অপরূপ রূপ নিয়েছে তাঁর কাব্যে, সেই গরবী ফুলগুলির খবর নেবার জন্যে আমাদের মন উৎসুক। তাদেরই সন্ধান এবার নেওয়া যাক। মহাকবি কালিদাস একচল্লিশটির বেশী ফুলকে তাঁর কাব্যে স্থান দেন নি। আশ্চর্য লাগে মনে করতে যে পথের দু'ধারের ফুলের ঝরণা-ধারা, মেঠো ফুলের দল, অগুন্তি নাম-না-জানা সব ফুল কবির মনে স্থান পায় নি। তিনি যেন বাঁধাধরা কয়েকটি ফুলের চৌহদ্দীর মধ্যে তাঁর কল্পনাকে ও ভাবকে বিচরণ করতে দিয়েছেন। রাজ-সভার কবি তিনি, যেন সংকুচিত হচ্ছেন. ভয় পাচ্ছেন মেঠো ফুলকে, অখ্যাত ফুলকে তাঁর কাব্যে স্থান দিতে। রাজ-সভা কবির পক্ষে এমনিই কাব্য-ঘাতিনী! আর এক মহাকবির কথা মনে পড়ে যায়। দেশবিদেশের কোনো ফুল বাদ পড়ে নি, রবীন্দ্রনাথের মনে ও কাব্যে তারা সবাই স্থান পেয়েছে। শুধু পদ্ম নয়, বকুল নয়, কেতকী নয়, আকন্দ ফুল, ঘাসের ফুল, কতোশতো অনাদৃত উপেক্ষিত ফুল অমর হয়ে রইলো তাঁর কাব্যে। অতীতের কাব্য-নির্দিষ্ট ফুলগুলি তাঁর সৌন্দর্য-বোধকে বন্দী করে রাখতে পারে নি তাদের রূপের সীমানার মধ্যে। শাস্ত্রের কিম্বা রাজ-দরবারের নির্দেশ মেনে ফুলের জাত-বিচার রবীন্দ্রনাথ করেন নি। অ-শাস্ত্রীয় ফুলের দল তাঁর কাব্যে রসের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে। কালিদাস এখানে হার মেনেছেন তাঁর সমগোত্রীয় এই মহাকবির কাছে। রাজ-সভা যেমন কাব্য-ঘাতিনী, শাস্ত্রবিধিও তেমনি কবির কল্পনা-নাশিনী।

কালিদাসের আদরের ফুলগুলির দিকে এখন নজর দেওয়া যাক। দেখা যাচ্ছে পদ্ম, কুমুদ, অশোক, শিরীষ আর চূতমঞ্জরী—এই কটি ফুলের উপর কালিদাসের অনুরাগ ছিলো সব চেয়ে বেশী। এই ফুলগুলিই তাঁর নানা কাব্যে দেখা দিয়েছে বারে বারে। তারপরে বকুল, কাশ, পলাশ, নবমল্লিকা, কুন্দ, কেতকী ও কর্ণিকার-এর সমাদর। শেফালিকা অনাদৃতা ও উপেক্ষিতা। মহাকবি মাত্র একবার তাকে স্মরণ করেছেন। শেফালীর কথায় মনে পড়ে যায় আর এক মহাকবির কথা। তিনি শুধু শিউলির বহিঃরূপটুকুই ধরে দেন নি, শেফালি বনের মনের কামনা'র রস তিনি আমাদের পান করিয়েছেন, আমাদের হৃদয়ের দুটি আঁখি ভরে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ শিউলির কামনার রূপ। এই অন্তর্লীনতার কাছ দিয়েও কালিদাস আস্‌তে পারেন নি। রূপের বার-মহলে ঘোরা-ফেরা করে তিনি নিজে ক্লান্ত, আমাদেরও ক্লান্ত করে ছেড়েছেন।

এবারে একটি একটি ক্রমে ফুল ধরে তার গন্ধ অনুসরণ করে কালিদাসের কাব্য-লোকে প্রবেশ করা যাক।

এক—যূথিকা

যূথিকা কবির মনকে তেমন বেশী নাড়া দিতে পারে নি। মহাকবির কাব্যে যূথিকার দেখা পাই মাত্র তিনবার—'মেঘদূতম্'-এর চতুর্থ অঙ্কে পূর্বমেঘে, ঋতু সংহারম্-এর দ্বিতীয় সর্গে বর্ষা বর্ণনায় আর 'বিক্রমোর্বশীয়ম্'-এর চতুর্থ অঙ্কে।

'ঋতু সংহারম্'-এর দ্বিতীয় সর্গে বর্ষাবর্ণনায় এই বর্ণনা আছে—

শিরসি বকুলমালাং মালতীভিঃ সমেতাম্
বিকসিতনবপুষ্পৈর্যূথিকাকুট্মলৈশ্চ
বিকচনবকদম্বৈঃ কর্ণপূরং বধূনাম্
রচয়তি জলদৌঘঃ কান্তবৎ কাল এষঃ॥ ২৪॥

যূথিকার কুঁড়ি মালতী কুসুম নব ফুলদলে গাঁথা
বকুলের মালা, প্রিয়জনসম সোহাগেতে ভরি মন,
বধূদের কালো চিকণ অলকে সাজায় বর্ষাঋতু,
কর্ণে পরায় প্রস্ফুট নব-কদম্ব-আভরণ।

'মেঘদূতম্'-এর পূর্বমেঘের কবিতাটি হচ্ছে

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বননদীতীরজাতানি সিঞ্চন্
উদ্যানানাং নবজলকর্ণৈর্যূথিকাজালকানি।
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং
ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্॥ ২৬॥

ঘুচিলে ক্লান্তি, নদীতীরজাত যূথীর কলিকাগুলি
সিঞ্চিত করি নববারিধারে করো সৌরভময়,
কপোলের স্বেদ মুছিতে যাদের কানের-কমল ম্লান
ছায়াদানে লভ চয়ন-ক্লান্তা নারীদের পরিচয়॥

"বিক্রমোর্বশীয়ম্'-এর চতুর্থ অঙ্কে পাই—"মদকল! যুবতি শশিকলা গজযূথম্! যূথিকাশবলকেশী! স্থিরযৌবনা স্থিতা তে দূরালোকে সুখালোকা।"

হে মদমত্ত গজরাজ, যুঁই ফুল কেশে দিয়ে যে নারী বিচিত্ররূপে সেজেছে সেই তোমার স্থিরযৌবনা প্রিয়া কি দূরদেশে অবস্থান করছে?

দুই—জপা

উজ্জয়িনীর রাজদরবারে জপার আদর বিশেষ ছিলো বলে মনে হয় না। কালিদাস শুধু একটিবার জপা-কে স্মরণ করেছেন মেঘদূতম্-এর পূর্বমেঘে। শঙ্করের

নৃত্য-বর্ণনায় কুরবক, শিরীষ ও কেশর—এরা যে সব বেমানান্ ও অশোভন মনে হবে! তাই শংকরের নৃত্যের ছবিকে সম্পূর্ণ করতে জপার ডাক পড়েছে। মেঘদূতের কবিতাটি হচ্ছে—

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজপাপুষ্পরক্তং দধানঃ
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টি ভক্তির্ভবান্যা॥ ৩৬॥

দুই ভুজ-তরু ঊর্ধ্বে উঠায়ে তাণ্ডব নাচে মাতিবেন শিব যবে,
করিও ব্যাপ্ত ভুজ-তরুবন জপাফুল সম রাঙা রঙে সন্ধ্যার,
ঘুচিবে ইচ্ছা শিবের তখন নৃত্যের কালে নাগাজিন পরিবার,
স্নেহভরে উমা স্তিমিত-নয়না হেরিবে তোমারে তবে॥

তিন—সিন্ধুবার

উমার দেহটি সাজাতে অশোক কর্ণিকার ফুলের সঙ্গে সিন্ধুবার ফুলের তলব পড়েছে—যদিও বারেকের তরে। ফুলটিকে একালের কোনো ফুলের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারছি নে। ফুলটি অজানা রয়ে গেলো, যদিও মুক্তার সঙ্গে তুলনা থেকে তার শুভ্র বরণ অতীতের অন্ধকার ভেদ করে আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছে। কুমারসম্ভবম্-এর তৃতীয় সর্গে উমার এই বর্ণনা আছে—

অশোকনির্ভর্ৎসিতপদ্মরাগমাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্ ।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী॥ ৫৩॥

অশোকফুলে পদ্মরাগ মাণিক হোলো লাঞ্ছিত, কর্ণিকার নিলো সোনার স্থান,
সিন্ধুবার রাজিল যেথা মুকুতা হতো বাঞ্ছিত, ফাগুনের ফুল দিল দেহে অবদান॥

চার—মধুক

একালে মধুকের আদর নেই শিক্ষিত সমাজে। থাকবেই বা কি করে? মালার আদর তো কমে গেছে একালের বরবর্ণিনীদের কাছে। অতো সময় কোথায় এ যুগের মালবিকা চতুরিকাদের যে তাঁরা ধীরে-সুস্থে প্রসাধন করবেন, লোধ্রফুলের রেণু মাখবেন মুখে, নয়নে কাজল দেবেন, হাতে লীলাকমল নেবেন, গলায় মধুকের মালা পরবেন! এখন এই যন্ত্রযুগের চলার ছন্দের সঙ্গে তাল মান রেখে তাঁদের প্রসাধনকে তাঁরা যুগোপযুগী করে নিয়েছেন। ছোট্ট কৌটা থেকে হরেক রকমের রঙ বের হয় কলের ধোঁয়ায় ধূসর তাঁদের বিবর্ণ কপোল রঙীন করবার জন্যে। অধরের জন্যে টিনের চোঙা থেকে বের হয় কট্‌কটে লাল রঙ। মুহূর্তে প্রসাধন সারা হয়, নেপথ্য-

বিধান আর নেই, সবার সামনেই প্রসাধন-লীলা। হায়রে! এতোটুকু মোহ উপভোগ করবার সুযোগ পুরুষদের দিতে এ'রা নারাজ। এ'রা এমনি ঘোর বাস্তবপন্থী! জীবন্ত সব মোহমুদ্গর এ'রা। হাতে এ'দের লীলাকমলের স্থান নিয়েছে বৃহদাকার ব্যাগগুলি—কৌটাও এযুগের লোধ্ররেণু পাওডারের আশ্রয়স্থল। মধুক কিন্তু আজও বে'চে আছে সাঁওতাল পল্লীবাসীদের মধ্যে। মহুয়ার কদর তারা জানে। পান করে তারা মহুয়া ফলের রস, মাথায়ও গোঁজে মহুয়ার হলদে ফুল সাঁওতাল রমণীরা।

মধুকের বর্ণনা আমরা পাই 'কুমার-সম্ভবম্'-এর সপ্তম সর্গে আর 'রঘুবংশম্'-এর ষষ্ঠ সর্গে। সেকালের নারীদের চুল শুকোনোর লীলা বর্ণনা করে কালিদাস 'কুমার-সম্ভবম্'-এ লিখেছেন ঃ—

"ধূপোষ্মণা ত্যাজিতমার্দ্রভাবং কেশান্তমন্তঃকুসুমং তদীয়ম্।
পর্য্যাক্ষিপৎ কাচিদুদারবন্ধং দূর্ব্বাবতা পাণ্ডুমধূকদাম্না॥ ১৪॥

ধূপের ধোঁওয়ায় শুষ্ক করিয়া কেশ, কুসুম সাজায়ে ঘন চিকুরের মাঝ,
শ্যামলদূর্বা পাণ্ডু মধূক ফুলে মালা গাঁথি নারী বাঁধিল অলক আজ।

'রঘুবংশম্'-এর ষষ্ঠ সর্গে স্বয়ম্বর সভায় ইন্দুমতীর বর্ণনা করে কবি বলেছেন—
"এবং তয়োক্তে তমবেক্ষ্য কিঞ্চিদ্বিস্রংসিদূর্ব্বাঙ্কমধূকমালা।
ঋজুপ্রণামক্রিয়য়ৈব তন্বী প্রত্যাদিদেশৈনমভাষমাণা॥ ২৫॥

বাক্য অন্তে হেরি তারে যবে নির্বাক হয়ে করিলো নীরস প্রণতি।
এলোমেলো হোলো দূর্বা-শোভিত মধূকমালিকাখানি, চলিলা ইন্দুমতী॥

পাঁচ—কাশ

শরতের আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফোটে শরতের কাশ। নীল আকাশে শুভ্র দুগ্ধফেনানিভ মেঘখণ্ড আর নদীর তীরে বালুর চরে, সবুজ মাঠের ধারে শরৎ মেঘের স্বপ্ন-মাখা কাশ ফুল। কাশের সৌভাগ্য যে এই পৃথিবীর দু'জন সেরা মহাকবির—কালিদাসের ও রবীন্দ্রনাথের—মনোহরণ করতে পেরেছে সে। মালব্যের কবি আর বাংলার কবি, তাঁরা দু'জনেই কাশের সৌন্দর্যে মুগ্ধ। শরতের কতো গানে, কতো কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কাশকে অপরূপরূপে চিরন্তন করে বে'ধে রেখেছেন। কালিদাসও কাশকে কম ভালবাসা ঢেলে দেন নি ও কম মাধুর্যের সঙ্গে তার ছবি আঁকেন নি। 'কুমারসম্ভবম্' কাব্যে ও 'ঋতুসংহারম্' কাব্যে কাশ ফুলের চমৎকার ছবি এ'কেছেন

কালিদাস। 'কুমারসম্ভবম্'-এর সপ্তম সর্গে কবি পার্বতীর বিবাহ-সজ্জার বর্ণনা করে বলছেন ঃ—

সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী গৃহীতপত্যুদ্গমনীয়-বস্ত্রা।
নির্বৃত্ত-পর্জন্যজলাভিষেকা প্রফুল্লকাশা বসুধেব রেজে॥ ১১॥

মঙ্গল স্নানে নির্মল দেহে বিবাহের রাঙা বাস, পরিলেন প্রিয়-মিলনের তরে সতী,
শুভ্রকাশের আভরণ-পরা বারিধারা-অভিষিক্তা, ধরণীর মত রাজিলেন পার্বতী।

'ঋতুসংহারম্' কাব্যের তৃতীয় সর্গে শরৎ-বর্ণনায় কাশের কথা বার বার জেগেছে কবির মনে। নব বধূ সাজে শরৎ এসেছে, তার রূপের বর্ণনা করে কবি বলছেন ঃ—

কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা সোন্মদহংসরবনূপুরনাদরম্যা।
আপক্বশালিরুচিরাতনুগাত্রযষ্টিঃ প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা॥ ১॥

শুভ্র কাশের অংশুক-পরা বিকচ-কমল-আননা মরালের ধ্বনি নূপুরেতে রণরণিয়া,
পক্ক ধানের শীষসম অতি-উজ্জ্বল-হেম-বরণা এসেছে শরৎ নববধূ সম সাজিয়া।

শরতের আকাশ ধরণী, বনতল, সায়র ও নদীজল কি সাজে সেজেছে, তার বর্ণনা করে কবি বলেছেন—

কাশৈর্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্বনান্তাঃ শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ॥ ২॥

কুমুদে শুভ্র সরোবর আজি, মরাল-শুভ্র নদীজল,
চন্দ্রকিরণে শুক্লা যামিনী, নবকাশফুলে ধরণী,
ছাতিম ফুলেতে শুভ্র বনানী, মালতী কুসুমে বনতল,
শরতে আজিকে সেজেছে সবাই মোহন শুভ্র-বরণী।

শরতের সাজের বর্ণনা করে ঋতুসংহারের তৃতীয় সর্গে কবি বলছেন ঃ—

বিকচকমলবক্ত্রা ফুল্লনীলোৎপলাক্ষী বিকসিতনবকাশশ্বেতবাসো বসানা।
কুমুদরুচিরকান্তিঃ কামিনীবোন্মদেয়ং প্রতিদিশতু শরদ্বশ্চেতসঃ প্রীতিমগ্র্যাম্॥ ২৬॥

নবীন কাশের শ্বেত অংশুক পরি,
বিকশিত নীল-উৎপল-আঁখি বিকচপদ্ম-আননা,
মদ-উন্মনা রমণীর প্রায় প্রীতিতে ভরুক চিত্ত
শরৎ-লক্ষ্মী শুভ্র কুমুদবরণা॥

ছয়—কুসুম্ভ

রক্ত-বরণ কুসুম্ভ হোলো বসন্তের ফুল। এ কালে নামের যুক্তাক্ষর বাদ দিয়ে আরো মিষ্টি কুসুম নামে পরিচিত। গ্রীষ্মকালে বনানীতে আগুন লেগেছে। সেই আগুনের রূপ দেখে লাল কুসুম্ভ ফুলকে স্মরণ করেছেন কবি। কুসুম্ভ ফুলকে তিনি ব্যবহার করেছেন সেই দাবানলের বর্ণনায়। 'ঋতুসংহারম্'-এর দ্বিতীয় সর্গে এই বর্ণনাটি আছে ঃ—

বিকচ নবকুসুম্ভ স্বচ্ছসিন্দুরভাসা প্রবলপবনবেগোদ্ভূত বেগেন তূর্ণম্।
তটবিটপলতাগ্রালিঙ্গন-ব্যাকুলেন দিশি দিশি পরিদগ্ধা ভূময়ঃ পাবকেন॥ ২৪॥

নব-কুসুম্ভ-পুষ্প-বরণ সিন্দুর-সম-রাঙা
আগুন প্রবল পবনে দ্বিগুন জ্বলে,
ব্যাকুল অনল অটবীলতারে বাঁধিতে আলিঙ্গনে
ধরণীরে ঘিরি দাহ করে পলে পলে।

তারপরে এসেছে বসন্ত দিন। তখন কি কুসুম্ভ ফুলকে ভুলে থাকা যায়? বিলাসিনীদের বসনের দিকে তাকালেই তো কুসুম্ভের অবদান চোখে পড়ে। বসন্তের দিনে বিলাসিনীদের রূপ-বর্ণনা করে 'ঋতুসংহারম্'-এর ষষ্ঠ সর্গে কালিদাস লিখেছেন ঃ—

কুসুম্ভরাগারুণিতৈর্দুকূলৈর্নিতম্ববিম্বানি বিলাসিনীনাম্।
রক্তাংশুকৈঃ কুঙ্কুমরাগ-গৌরৈরলংক্রিয়ন্তে স্তনমণ্ডলানি॥ ৪॥

রাঙায়ে দিয়েছে বিলাসিনীদের চারু নিতম্ব, মরি,
নব কুসুম্ভে রাঙানো বসন আজি বসন্ত-দিনে,
কুঙ্কুমে রাঙা লঘু উত্তরী স্তন-মণ্ডলোপরি
অপরূপ কোন্ সুষমার সুর বাজিছে দেহের বীণে।

সাত—লবঙ্গ

কালিদাসের বড়ো প্রিয় ছিলো মালব্য ও মলয়স্থলী। পুগ, তমাল ও চন্দনের মতো লবঙ্গও হচ্ছে সেই মলয়স্থলীর গাছ।

মলয়স্থলীতে লবঙ্গ ফুলের রেণু-মাখা বাতাস কেমন করে প্রেয়সী নারীর ক্লান্তি দূর করতো তার মনোহর বর্ণনা আছে—কুমারসম্ভবম্-এর অষ্টম্ সর্গে—

তস্য জাতু মলয়স্থলীরতের্ধূতচন্দনলতঃ প্রিয়াক্লমম্।
আচচাম সলবঙ্গকেশরশ্চাটুকার ইব দক্ষিণানিল॥ ২৫॥

লবঙ্গ ফুল-কেশর মাখিয়া চন্দনবন কাঁপায়ে দখিন বায়,
চাটুকার সম ঘুচাতো প্রিয়ার সুরত-ক্লান্তি মলয়স্থলী-ছায়॥

লবঙ্গ ফুল ফোটে সাগরের দ্বীপে। সেখান থেকে সেই ফুলের গন্ধ ভেসে

আসে তাল-বনানীর মর্মর-মুখরিত সিন্ধুতীরে। রঘুবংশম্-এর ষষ্ঠ সর্গে কালিদাস সেই সিন্ধুতীরের বর্ণনা করেছেন—

অনেন সার্দ্ধং বিহরাম্বুরাশেস্তীরেষু তালীবনমর্ম্মরেষু।
দ্বীপান্তরানীত-লবঙ্গপুষ্পৈরপাকৃত স্বেদলবামরুদ্ভিঃ॥ ৫৭॥

তালবনানীরমর্মরধ্বনিমুখর সিন্ধুতীরে
প্রিয় সাথে বালা বিহর পরম সুখে,
সাগরদ্বীপের লবঙ্গফুল-গন্ধ বহিয়া আনি
ঘুচাবে পবন সুরত-ক্লান্তি বুকে।

আট—পুন্নাগ

পুন্নাগ হলো আমাদের নাগকেশর। এই ফুল সেদিন সাধারণ-আদৃত ছিলো বলে তো মনে হয় না। আমাদের কালেও নয়। অথচ সাধারণ-উপেক্ষিত এই ফুল কালিদাসের ও রবীন্দ্রনাথের রসানাভূতির দাক্ষিণ্য লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় নাগকেশর বারে বারে দেখা দিয়েছে। যারা চলে যাবার সময় প্রাণকে উদাস করে পাগল করে দিয়ে যায় তাদের কথা যে গানটিতে বেঁধেছেন রবীন্দ্রনাথ সেই গানে সেই "চলে-যাওয়ার দল"-এর মধ্যে যে "নাগকেশরের ঝরা কেশর ধুলার সাথে মিতা" সেও স্থান পেয়েছে।

কালিদাস নাগকেশরকে তাঁর কাব্যে একটি বার মাত্র স্থান দিয়েছেন আর সেও নেহাৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। নাগকেশরের কোন মর্যাদা কবির কাছে ছিলো না। 'রঘুবংশম্'-এর চতুর্থ সর্গে কালিদাস মত্তহস্তীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন ঃ—

খর্জ্জুরীস্কন্ধনদ্ধানাং সদোদ্গারসুগন্ধিষু।
কটেষু করিণাং পেতুঃ পুন্নাগেভ্যঃ শিলীমুখাঃ॥ ৫৭॥

খেজুর-স্কন্দে বন্ধ মত্ত-বারণ-গণ্ড হতে,
অবিরল ধারে মধুর-গন্ধ মদধারা পড়ে ঝরি,
সেই সুগন্ধে আকুল হইয়া ব্যাকুল ভ্রমরদল
পুন্নাগ ত্যজি বসিছে আসিয়া তাদের কপোলোপরি।

নয়—শেফালিকা

নাগকেশরের প্রতি উপেক্ষা না হয় ক্ষমা করা গেলো, কিন্তু শিউলির প্রতি কবির যে অনাদর, এটা কি করে ক্ষমা করা যায়? যে ফুল তার গন্ধ দিয়ে, রূপ দিয়ে কঠিন-হৃদয় অ-ভাবুকেরও প্রাণের বন্ধ আগল খুলে অন্তরে পশে, সেই শিউলিকে শুধু বারেকের তরে আস্তে দিলেন কালিদাস তাঁর কাব্যলোকে, এ বড়ো আশ্চর্য বলে ঠেকে। মনে হয় যাঁরা উপমার বস্তুগুলি পর্যন্ত ধরে বেঁধে ঠিক করে দিতেন কাব্যের সেই আচার্যদের কাছে শিউলির কোনো আদর ছিলো না

কালিদাসের কালে। আর বস্তুতান্ত্রিক রাজদরবার আর বিলাসিনীরা, সূক্ষ্ম জিনিসের কদর করা উভয়েরই প্রকৃতিগত নয়। বেচারী কালিদাস! কাব্যের সংস্কার আর রাজদরবার ও বিলাসিনীদের স্থূল রুচি-বোধ—এই তিনটির দম-বন্ধ-করা বন্ধনের মধ্যে তাঁকে কাব্য-সৃষ্টি করতে হোতো। অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী না হোলে কি এই সেই আট-ঘাট-বাঁধা কালের বন্ধনের মধ্যে এমন সব অনুপম সৃষ্টি তিনি কখনো করতে পারতেন?

'ঋতুসংহারম্'-এর তৃতীয় সর্গে শরতের উপবন বর্ণনা করেছেন কালিদাস। সেই বর্ণনায় কবি শিউলিকে ডেকে এনে যতো সংক্ষেপে তার সমাদর সেরে নিয়ে সরে যেতে পারেন তাই করেছেন। বল্ছেন কবি—

শেফালিকাকুসুমগন্ধমনোহরাণি স্বস্থস্থিতাণ্ডজকুলপ্রতিনাদিতানি।
পর্য্যন্তসংস্থিতমৃগীনয়নোৎপলানি প্রোৎকণ্ঠয়ন্ত্যুপবনানি মনাংসি পুংসাম॥ ১৪॥

শেফালি ফুলের রঙে রাঙা উপবনে
পাখির কাকলীগান উঠিয়াছে বাজি,
হরিণী-নয়ন-কমল পাইছে শোভা
পুরুষ-চিত্ত উতলা করিছে আজি।

দশ—কহ্লার

পদ্ম ও কুমুদ এরা তো অলংকার শাস্ত্র ও রাজদরবারের রুচির নির্দেশে ফুলেদের মধ্যে অভিজাত বংশীয়। তা'ছাড়া রূপের দিক থেকে তাদের নিজস্ব দাবীও কিছুটা আছে বৈকি। তবে যতোটা প্রাধান্য তাদের দেওয়া হয়েছে ততোটা গৌরব পাবার উপযুক্ত তারা কিনা সে বিষয়ে মনে সন্দেহ আছে। কবিরা সংস্কার বশে পদ্ম বলতেই আত্মহারা, তুলনা করতে গেলেই পদ্ম এসে হাজির হয়। কালিদাসের কাব্যে পদ্মের ছড়াছড়ি—তবে সেটা লাল পদ্ম। শাদা পদ্ম, নীল পদ্ম তেমন সমাদর পায় নি তাঁর কাব্যে। 'ঋতুসংহারম্-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ-বর্ণনায় কহ্লার, শাদাপদ্ম কোনো রকমে তার স্থান করে নিয়েছে। কবি বল্ছেন ঃ—

কহ্লারপদ্মকুমুদানি মুহুর্ব্বিধুন্বংস্তৎসঙ্গমাদধিক শীতলতামুপেতঃ।
উৎকণ্ঠয়ত্যতিতরাং পবনঃ প্রভাতে পত্রান্তলগ্নতুহিনাম্বুবিধুয়মানঃ॥১৫॥
পদ্মকুমুদ কহ্লারে কাঁপাইয়া তাদের পরশে সুশীতল সমীরণ,
পত্রলগ্নশিশির বহিয়া আনি করে বায়ু আজ ব্যাকুল সবার মন।

এগারো—স্থলকমলিনী

একটি কবিতাতেই স্থলপদ্ম যে গৌরব লাভ করেছে 'মেঘদূতম্'-এ তা অন্য ফুলগুলির ভাগ্যে কচিৎ ঘটেছে। অলকায় প্রিয়ার ভবনে প্রিয়াকে কি ভাবে মেঘ

দেখ্‌তে পাবে তার বর্ণনা যক্ষ মেঘকে দিচ্ছেন। যক্ষ-প্রিয়ার আর যে সব বর্ণনা 'মেঘদূতম্‌'-এ আছে, সেগুলি সবই শুধু নারীদেহের বর্ণনা। এই কটি লাইনে দেহের সঙ্গে মন এসে মিশেছে। দেহের ও মনের মধ্যে ব্যবধান ঘুচে গেছে। নিছক্‌ দেহের গন্ধ একেবারেই নেই এই লাইনগুলিতে, আছে শুধু স্নিগ্ধ বেদনার মধুর প্রশান্তি।

'মেঘদূতম্‌'-এর উত্তর মেঘের সেই কবিতাটি হচ্ছে—

পাদানিন্দোরমৃতশিশিরাঞ্জালমার্গপ্রবিষ্টান্‌
পূর্বপ্রীত্যা গতমভিমুখম্‌ সংনিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃ খেদাত্‌ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্‌॥ ৩১॥

বাতায়নপথে চন্দ্রকিরণ প্রবেশি কক্ষে জাগাবে যখন অমৃত-শীতল-নেশা,
অতীতের প্রীতি স্মরি তার পানে ধাইবে সহসা প্রিয়ার দুইটি আঁখি
কি পরিয়া মনে থামিবে সহসা, বেদনা-সিক্ত ঘন পল্লবে নয়ন দুইটি ঢাকি,
মনে হবে যেন বাদল দিনের স্থলকমলিনী জাগা-না-জাগায় মেশা।

বারো—কুন্দ

কুন্দ কবির সোহাগ পেয়েছে। 'মেঘদূতম্‌', 'ঋতুসংহারম্‌', 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্‌' 'বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্‌' ও 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌', এই কাব্য ও নাটিকাগুলিতে কুন্দ তার সৌন্দর্যের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে মহাকবির কাছ থেকে। চর্মণ্বতী নদী পার হয়ে মেঘ যখন দশপুর জনপদে যাবে তখন দশপুর-নারীর ভ্রূবিলাসাচাতুরী দেখবার সৌভাগ্য তার হবে। 'মেঘদূতম্‌'-এর পূর্বমেঘে এই দশপুরবধূদের অপাঙ্গ-লীলার অপূর্ব বর্ণনা আছে। কবি বলছেন—

তামুত্তীর্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমাণাং
পক্ষ্মোতেক্ষপাদুপরিবিলসত্‌কৃষ্ণশারপ্রভাণাম্‌।
কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিম্বং
পাত্রীকুর্বন্দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাম্‌॥ ৪৭॥

চর্মণ্বতী পার হয়ে মেঘ, যেও আনন্দে সেই দশপুর পানে
যেথা বধূদের ভ্রূলতা-বিলাস মনোহরা লতা সম শোভে সর্পিলা,
যবে কুতূহলে তারা কালো-পল্লব আঁখি তোমা পানে হানে,
মনে হয় যেন নব-প্রস্ফুট শুভ্র কুন্দফুলে কালো মধুপের নয়ন-ভোলানো লীলা।

তারপরে মেঘ যখন অলকায় পৌঁছবে তখন যে রমণীদের দেখবে তারা যে সৌন্দর্যে আর সব নারীদের হার মানাবে, অন্তত কাব্যের ও যক্ষের খাতিরে, সেটা তো আমরা সহজেই ধরে নিতে পারি। কাব্যটি হচ্ছে বিরহী যক্ষ ও তার প্রিয়াকে নিয়ে।

যে প্রিয়ার জন্যে যক্ষের এতো ব্যাকুলতা, যার জন্যে মেঘকে পর্যন্ত সে সন্দেশবাহীর কাজে লাগিয়াছে, সেই প্রিয়া তো অলকার নারী। তাই অলকা-র সাধারণ নারীরা যে কি অপরূপ সুন্দরী সেটা তো জানাতে হবে, তবে তো তাদের মধ্যে যে সর্বোত্তমা সেই যক্ষ-প্রিয়ার অতুলনীয়তা আমাদের বোধগম্য হবে। তারপরে যাকে দিয়ে খবর পাঠাতে হবে, অলকাপুরী-সুন্দরীদের অনুপম রূপের বর্ণনা দিয়ে তাকে প্রলুব্ধ করা তো প্রাচীন ও নবীন কোনো চাতুর্য-বিধি-বহির্ভূত নয়। এই নিরপরাধ ডিপ্লোমাসির জন্যে যক্ষকে দোষী করা কোনো মতেই চলে না। 'মেঘদূতম্'-এর উত্তর মেঘে অলকা-পুরবাসিনীদের এই মোহন বর্ণনা যক্ষ করছেন—

হস্তেলীলাকমলমলকং বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥ ২॥

বধূদের হাতে লীলার কমল, কুন্দ কুসুম অলকে,
পাণ্ডু আননে আনিয়াছে শ্রী লোধ্র-রসের ঝলকে।
বেণীতে তাদের নব কুরবক কর্ণে শিরীষ অতুল,
সীঁথিতে তাদের বর্ষার দূতী নব-কদম্ব দোদুল।

এ ছাড়াও 'মেঘদূতম্'-এর উত্তর মেঘে "আশ্বাশৈবং প্রথমবিরহোদগ্রশোকাং সখীমূতে" ইত্যাদি যে চারটি লাইন আছে তাতেও "প্রাতঃকুন্দপ্রসবশিথিলংজীবিতং ধারয়েথা।" এই লাইনে কুন্দ ফুলের বর্ণনা আছে। কিন্তু এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বলে পণ্ডিতদের অভিমত। তাই এই শ্লোকটির উল্লেখ করেই ক্ষান্ত দিলুম।

শীতের অবসানে বসন্তের কুন্দ ফুল দেখা দিয়েছে। ঋতুসংহারম্-এর ষষ্ঠ সর্গে বসন্তবর্ণনায় কালিদাস কুন্দের শুভ্রতাকে বিলাসিনী নারীর হাস্যের মতো শুভ্র বলে বর্ণনা করেছেন। বিলাসিনী নারীর হাসি যে কি করে শুভ্র বলে ঠেকেছিলো মহাকবির চোখে তা বোঝা গেলো না। কুন্দ লাঞ্ছিত হোলো এই ব্যর্থ তুলনায়। শ্লোকটি হচ্ছে এই—

কুন্দৈঃ সবিভ্রমবধূ-হসিতাবদাতৈরুদ্দ্যোতিতানুপবনানি মনোহরাণি।
চিত্তং মুনেরপি হরন্তি নিবৃত্তরাগং প্রাগেব রাগমলিনানি মনাংসি যূনাম্॥ ২২॥

মিলন-পিয়াসী রমণীর হাসি শুভ্র কুন্দফুল,
আজি সুন্দর উপবনে ওঠে ফুটে,
নিস্পৃহ-মুনি চিত্তটিরেও হরিছে কুন্দ ফুল
ভোগী-যুব-হিয়া আগেই নিয়েছে লুটে।

ঋতু-সংহারম-এর ষষ্ঠ সর্গে নিম্ন-লিখিত এই শ্লোকটিও পাওয়া যায়। এটি

কালিদাস রচিত নয় বলে পণ্ডিতদের ধারণা। এই শ্লোকটিতে কুন্দ ফুলের উল্লেখ আছে।

পরভৃত-কলগীতৈর্হ্লাদিভিঃ সদ্বচাংসি
স্মিতদশনময়ূখান্ কুন্দপুষ্পপ্রভাভিঃ।
করকিসলয়কান্তিং পল্লবৈর্বিদ্রুমাভৈর
উপহসতি বসন্তঃ কামিনীনামিদানীম্॥

মধুর কোকিলকূজনে নারীর মধুর কণ্ঠধ্বনি
হাসিমাখা চারু দশনের শোভা বিকচ কুন্দফুলে,
সুন্দর করপল্লবশোভা নবকিশলয় দলে,
আজি বসন্ত এদেরে দেখায়ে উপহাসে নারীকুলে।

'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'-এর তৃতীয় অঙ্কে বিদূষকের কাছে রাজা মালবিকার রূপ-বর্ণনা করছেন—শাদার সঙ্গে ঈষৎ-হলুদে-মেশানো মালবিকার কপোলদুটির রঙ। রুচি তার এমনি মার্জিত যে সে বাহুল্যের দিকে কখনো যায় না, কখনো বেশী অলংকারে সাজায় না তার দেহ। বলছেন রাজা—

শরকাণ্ডপাণ্ডু গণ্ডস্থলেয়মাভাতি পরিমিতাভরণা,
মাধবপরিণতপত্রা কতিপয় কুসুমেব কুন্দলতা॥

শরবৃক্ষের কাণ্ডের মতো পীতাভ কপোল-শোভা,
পরিমিত-আভরণা সুন্দরী যৌবনভারনতা,
যেন চৈতালি রোদে হলুদ-বরণ-পল্লব মনলোভা,
স্বল্প-ফুলের-আভরণ-পরা তন্বী কুন্দলতা।

দুষ্মন্তের সভায় যখন শার্ঙ্গরব ও গৌতমীর সঙ্গে শকুন্তলা এসে হাজির হয়েছেন, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটিকায় পঞ্চম অঙ্কে কালিদাস সেই দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন। দুর্বাশার শাপে দুষ্মন্ত শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর প্রণয়-লীলা ভুলে গেছেন। অম্লান-লাবণ্যময়ী শকুন্তলাকে দেখে রাজা আকৃষ্ট হয়েছেন অথচ স্মরণ করতে পারছেন না এই নারীকে। মন সন্দেহে দোলায়িত। একে নিতেও পারছেন না, বিদায় দিতেও প্রাণ চায় না। ঠিক যেমন ভ্রমর কুন্দকোরকে বসতে চায়, কিন্তু শিশিরে কোরক পূর্ণ থাকায় সেখানে বসতে পায় না, চারিদিকে ঘুরে মরে। দুষ্মন্ত বলছেন—ইদমুপনতমেবং রূপমাক্লিষ্টকান্তি,

প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেত্যেব বস্যন্।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং

ন চ খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি হাতুম্॥
অম্লান-রূপলাবণ্যভরা এই সুন্দরী নারী
ছিল কি আমার কিম্বা ছিল না সন্দেহ মনে জাগে,
শিশিরপূর্ণ কুন্দ-কোরকে ভ্রমর বসিতে নারে
সেই মত এরে নিতেও পারি না, ছাড়িতে যে ব্যথা লাগে।

বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্-এ মাধবীলতা ও কুন্দলতার কথা আছে, কুন্দ ফুলের কোনো উল্লেখ নেই। বাতাস মাধবীলতা ও কুন্দলতাকে কম্পিত করছে, নৃত্য-ছন্দে দোলাচ্ছে, বাতাসের এই কৌতুক-লীলা তার স্নেহ ও দাক্ষিণ্য বলে বোধ হচ্ছে। বাতাস যেন প্রেমিক, মাধবী ও কুন্দকে নিয়ে তাই এই খেলা। বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্-এর দ্বিতীয় অঙ্কে পবনের এই লীলা লক্ষ্য করে রাজা বিদূষককে বলছেন—

নিষিঞ্চন মাধবীমেতাং লতাং কৌন্দীং চ নর্তয়ন।
স্নেহদাক্ষিণ্যয়োর্যোগাৎ কামীব প্রতিভাতি মে॥

কম্পিত করে মাধবীলতারে বায়ু,
কুন্দলতারে দোলায় নৃত্য-তালে,
বাতাসের লীলা দেখে মনে হয় বাতাস প্রেমিক বুঝি
স্নেহ-উদারতা তাই লতা-পরে ঢালে।

তেরো—লোধ্র

সৌন্দর্যের সঙ্গে উপকারিতার যোগ সব সময়ে থাকে তা ধর্মবুদ্ধি থাকলে সব সময়ে বলা যায় না। তুলনায় বহু-প্রচারিত মাকাল ফল তার সর্বজনবিদিত দৃষ্টান্ত। লোধ্র কিন্তু এ দোষে দোষী নয়। লোধ্র ফুল দেখতেও যেমন সুন্দর, কাজেও তেম্নি আসে। তার রেণু পাউডারের মতো করে মুখে মাখতেন সে যুগের সুন্দরীরা। লোধ্র ফুলের রসও সুন্দরীরা মুখে মাখতেন। তাতে তাঁদের পাণ্ডুর মুখ শুভ্র দেখাতো। 'ঋতুসংহারম্'-এর চতুর্থ সর্গে হেমন্তবর্ণনায় কবি বলছেন—

নবপ্রবালোদ্গমশস্যরম্যঃ
প্রফুল্ললোধ্রঃ পরিপক্বশালিঃ।
বিলীনপদ্মঃ প্রপতত্তুষারো
হেমন্তকালঃ সমুপাগতোঽয়ম্॥ ১॥

নবকিশলয়ে সুন্দর আজি তরুদল প্রান্তরে,
পাকিয়াছে ধান, লোধ্র কুসুম-নত,
বিলীন হয়েছে সায়রে পদ্ম, পড়িছে তুষার ঘন,
হেমন্তকাল আজি প্রিয়ে সমাগত।

'কুমারসম্ভবম্' কাব্যের সপ্তম্ সর্গে পার্বতীর গৌর বরণের অনুপমতার বর্ণনা করে কালিদাস বল্‌ছেন যে এমন উজ্জ্বল উমার শুভ্র দেহ-কান্তি যে ঝল্‌সে যেতো চোখ, কেউ তাকাতে পারতো না তাঁর দিকে যদি না কানের যবাঙ্কুরের আভরণ সেই শুভ্রতাকে সহনীয় করে তুল্‌তো। বলছেন কবি—

কর্ণার্পিতোলোধ্রকষায়রুক্ষে
গোরোচনাক্ষেপনিতান্তগৌরে।
তস্যাঃ কপোলে পরভাগলাভাদ্
ববন্ধ চক্ষুংষি যবপ্ররোহঃ॥

কপোল দুইটি রুক্ষ উমার লোধ্র ফুলের রসে,
অতীব শুভ্র হইল কপোল গোরোচনা-অবলিপ্ত,
তাকানো যায় না কপোলের পানে এমনি উজল-শুভ্র,
যব-অঙ্কুর কর্ণে পরায় নয়ন হইল তৃপ্ত।

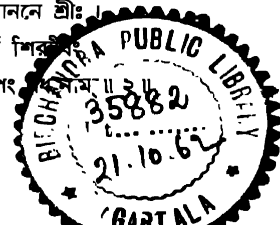
বিবাহের মঙ্গল-স্নান করাবার জন্যে উমাকে নিয়ে চল্‌লো সখিরা। কতো তার আয়োজন। তার বর্ণনা করে কুমারসম্ভবম্-এর সপ্তম্ সর্গে কবি বল্‌ছেন—

তাং লোধ্রকল্কেন হৃতাঙ্গতৈলা—
মাশ্যান কালেয়কৃতাঙ্গরাগাম্।
বাসো বসানামভিষেকযোগ্যং
নার্যশ্চতুষ্কাভিমুখমনৈষুঃ॥

লোধ্রফুলের তৈল মাখালো উমার কোমলদেহে
কালেয়-রচিত অঙ্গরাগটি অনঙ্গ-মন টানে,
স্নানের বসনে সাজায়ে উমারে সযতনে সখিদল,
নিয়ে চলে তারে মহা-আনন্দে ধারামণ্ডপপানে।

সুন্দরীদের মুখ-শ্রীর বর্ণনায় লোধ্রকে বাদ দেবার যো নেই। শুধু আমাদের এই মর্তলোকের সুন্দরীদের নয়, অলকাপুরীর সুন্দরীদের লাবণ্য ম্লান ঠেকবে রসিকদের নয়নে যদি না লোধ্র ফুলের রেণু তাঁরা মেখেছেন এটি আগেভাগে জানিয়ে দেওয়া হয়। তাই 'মেঘদূতম্'-এর উত্তর মেঘখণ্ডে যেখানে যক্ষ অলকাবাসীদের রূপ-বর্ণনায় পঞ্চমুখ, সেখানে যক্ষ বল্‌ছেন—

হস্তেলীলাকমলমলকং বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥ ২॥



বধূদের হাতে লীলার কমল, কুন্দ কুসুম অলকে,
পাণ্ডু আননে আনিয়াছে শ্রী লোধ্র-রসের ঝলকে।
বেণীতে তাদের নব কুরবক কর্ণে শিরীষ অতুল,
সীঁথিতে তাদের বর্ষার দূতী নব-কদম্ব দোদুল।

কবির কল্পনা কোনো বাঁধন মানে না। পাটল রঙের বনভূমিতে সিংহ বিরাজমান। এই ছবিটি কবির মনে আর একটি ছবি সৃষ্টি করলো—পাহাড়ের পাটলবরণ অধিত্যকায় দাঁড়িয়ে আছে লোধ্র তরু ফুল্লকুসুমে ভরা। 'রঘুবংশম্'-এর দ্বিতীয় সর্গে এই শ্লোকটি আছে— স পাটলায়াং গবি তস্থিবাংসং

ধনুর্ধর কেসরিণং দদর্শ।
অধিত্যকায়ামিব ধাতুময্যাং
লোধ্রদ্রুমং সানুমতঃ প্রফুল্লম্॥ ২৯॥

হেরিলেন তবে মৃগয়াভিলাষী নৃপতি ধনুর্ধর
রক্তবরণ বনভূমিতলে সিংহ বিরাজ করে,
যেন পাহাড়ের পাটল-বরণ উচ্চভূমির পর
ফুটিয়া উঠেছে লোধ্র বৃক্ষ নবকুসুমেতে ভরে।

শুধু কি তাই? রাজ্ঞী সুদক্ষিণার সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছে। কৃশ তাঁর দেহ, মুখখানি পাণ্ডুর। সেই পাণ্ডুর মুখ লোধ্র ফুলের পাণ্ডুর রং মনে পড়িয়ে দিলো। 'রঘুবংশম্'-এর তৃতীয় সর্গে সুদক্ষিণার এই বর্ণনা আছে—

শরীর সাদাদসমগ্রভূষণা
মুখেন সালক্ষ্যতে লোধ্র-পাণ্ডুনা।
তনু-প্রকাশেন বিচেয় তারকা
প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্ব্বরী॥ ২॥

স্বল্পাভরণা সুদক্ষিণার কৃশ মধু-তনুখানি,
পাণ্ডুর মুখ লোধ্র ফুলের পাণ্ডুতা নেছে হরি,
এ মধুর রূপ হেরি মনে হয় যেন এই অঙ্গনা
ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় আসন্ন-ঊষা তারাহীনা শর্বরী।

চোদ্দ—কুরবক

বসন্তের ফুল কুরবক। বসন্তের মতো রঙীন তার লাল ফুল। কুরবকের ফুটে-ওঠার রহস্য জানতেন যে রসিকেরা তাঁদের মতে—আলোকনাৎ কুরবকং কুরুতে বিকাশম্—সুন্দরীদের নয়নের স্পর্শ পেলেই কুরবক ফুল ফুটিয়ে দেয়। বসন্তের দিনে বরবর্ণিনীদের কালো কেশে শোভা পেতো রক্তিম-বরণ কুরবক ফুল। নারীরা তখন জানতেন প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে রঙ বাছাই করে নিজেদের সাজাতে। এখনকার মতো

দোকানের থাক থেকে নির্বিশেষে সাধার ; তাঁরা আহরণ করতেন না। সেকালের নারী বিশেষের দ্বারা রুচির পরিচয় দিত একালের নারী কি রুচিতে কি লালিত্যে অ-বিশেষের পূজারিণী। কুরবক খুব বেশী না এলেও মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে কালিদাসের কাব্যে। 'মেঘদূতম্'-এর উত্তর মেঘে কুরবক দু'বার দেখা দিয়েছে। অলকা-বাসিনী বধূদের রূপ ও প্রসাধন বর্ণনা করে যক্ষ মেঘকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করেছে। যক্ষ-প্রিয়ার কাছে তাড়াতাড়ি তার খবরটি পৌঁছে দিতে যক্ষ ব্যাকুল। তাই. আষাঢ়ের মন্থর মেঘকে চপল-গতি করবার জন্যে যক্ষ যদি অলকার বধূদের রূপ-বর্ণনা করে থাকে তো এমনই বা কি অপরাধ করেছে!

হস্তে লীলাকমলমলকং বালকুন্দানুবিদ্ধং ।
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষম্
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥ ২ ॥

বধূদের হাতে লীলার কমল. কুন্দ কুসুম অলকে
পাণ্ডু আননে আনিয়াছে শ্রী লোধ্র-রসের ঝলকে ।
বেণীতে তাদের নব কুরবক কর্ণে শিরীষ অতুল.
সীঁথিতে তাদের বর্ষার দূতী নব-কদম্ব দোদুল ।

অলকায় কুবেরের প্রাসাদের উত্তরে যক্ষের বাড়ি। সেই বাড়ির বর্ণনা করে যক্ষ বলছেন ঃ—

রক্তাশোকশ্চলকিসলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য ।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্‌ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥ ১৭ ॥

সেথা রক্ত-অশোক বকুলেতে নবপল্লব-শিহরণ.
মাধবীকুঞ্জ বিরাজে সেথায় কুরবকবীথি মাঝে.
অশোক সে চায় তোমার সখির বামপদপরশন.
ফুল ফোটাবার ছলেতে বকুল মুখের মদিরা যাচে ।

অযোধ্যা নগরীতে বসন্ত কাল সমাগত। নব-প্রস্ফুট অশোক লোকের মনে অনুরাগের উদ্দীপনা আন্‌লো। অশোকের নব পল্লবগুলি নারীরা কর্ণভূষণ করলো। শুধু অশোক নয়, কুরবকও বসন্তের দূত হয়ে এলো অযোধ্যার উপবনে। রঘুবংশের নবম সর্গে তার বর্ণনা করে কালিদাস লিখ্‌ছেন ঃ—

বিরচিতা মধুনোপবনশ্রিয়ামভিনবা ইব পত্র-বিশেষকাঃ ।
মধুলিহাং মধুদানবিশারদাঃ কুরবকা রবকারণতাং যযুঃ ॥ ২৯ ॥

আজি বসন্তে নবপ্রস্ফুট কুরবক ফুল দিয়া
বনলক্ষ্মীর দেহেতে পত্রলেখা করে অঙ্কিত,
মধুদান দিতে উদার ও নিপুণ কুরবক-ফুল-হিয়া
মধুপানরত ভ্রমর-সোহাগে গুঞ্জন-মুখরিত।

'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'-এর তৃতীয় সর্গে দেখছি নৃপতি অগ্নিমিত্রের আর দিন কাটতে চায় না। কোন কাজে তাঁর মন লাগে না। হৃদয় আকুল হয়ে রয়েছে মালবিকার জন্যে। বয়স্য বিদূষককে রাজা বল্লেন—দিন শেষ হয়ে গেলো, এখন এই সময়টা কোথায় কাটানো যায় বলতো? বিদূষক তার উত্তরে বল্লেন ঃ—অদ্যৈব প্রথমাবতার-সুভগানি রক্তকুরবকাণি উপায়ন প্রেষ্য নববসন্তাবতারব্যপদেশেন ইরাবত্যা নিপুণিকা-মুখেন প্রার্থিতো ভবান। ইচ্ছামি আর্য্যপুত্রেণ সহ দোলাধিরোহণমনুভবিতুমিতি। ভবতাপি প্রতিজ্ঞাম্। তৎ প্রমদ-বনমেব গচ্ছাম॥ ১৯॥

নব বসন্তের প্রীতি-উপহারের ছলে আজই রানী ইরাবতী তোমাকে সদ্য-ফোটা রক্তকুরবক ফুল পাঠিয়ে দিয়েছেন ও নিপুণিকার মুখ দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন—বড় সাধ হয়েছে আর্যপুত্রের সঙ্গে দোলায় চড়তে। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করবে এই প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছ। চলো তবে প্রমোদ-কাননে যাই।

প্রমোদ-কাননে গিয়ে বিদূষক রাজাকে বল্লো—দেখ, আজ বসন্তলক্ষ্মী কি সুন্দর সাজে সেজেছে নানা ফুলের গয়না পরে। নারীদের প্রসাধন লাগে কোথায় এর সাজের কাছে!

রাজা বল্লেন, সত্যিই তাই, আমি বসন্তের বন-লক্ষ্মীর শোভা দেখে অবাক হয়ে দেখ্‌ছি—

রক্তাশোকরুচা বিশেষিতগুণো বিম্বাধরালক্তকঃ
প্রত্যাখ্যাতবিশেষকং কুরবকং শ্যামবদাতারুণম্।
আক্রান্তা তিলকক্রিয়াপি তিলকৈর্লগ্নদ্বিরেকাঞ্জনৈঃ
সাবজ্ঞেব মুখপ্রসাধনবিধৌ শ্রীর্মাধবী যোষিতাম্॥ ৩০॥

রক্ত-অশোক নারী-অধরের লালিমা-গর্ব হরে,
শ্যাম শ্বেতলাল কুরবক দেয় পত্রলেখারে লাজ,
ললাট-তিলকে তিলক ফুলের অলি-শোভা ম্লান করে,
হতমান হোলো সুন্দরীদের প্রসাধন-কলা আজ।

বিদূষক রাজাকে বল্‌লেন, শুনলে তো বন্ধু মালবিকা কি বল্লেন? তিনি বল্লেন তিনি উৎকণ্ঠিতা হয়েছেন। রাজা বল্লেন শুনলুম বটে, কিন্তু এর থেকে তুমি যা অনুমান করছ সেটি ঠিক, এটা মানতে পারছি না। কেননা কারণবশত মানুষ উৎকণ্ঠিত হয় তা নয়, অকারণেও উৎকণ্ঠা জাগে মনে।

বোঢ়া কুরবককরজসাং কিসলয়পুটভেদ-শীকরানুগতঃ
অনিমিত্তোৎকণ্ঠামপি জনয়তি মনসো মলয়াবাতঃ॥ ৪৪॥
শীকর-শীতল মলয় পবনে নব কিশলয় জাগে,
কুরবক-রেণু-বাহী বায়ু ভরে হিয়া অকারণ অনুরাগে।

'বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্'-এর দ্বিতীয় অঙ্কে বসন্তশোভা বর্ণনায় কুরবক মহাকবির কাছে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। বসন্ত কাল। রাজা পুরূরবা তাঁর বিদূষককে নিয়ে প্রমোদবনে বেড়াচ্ছেন। বিদূষক রাজাকে বল্লেন—প্রেক্ষতাং ভবান বসন্তাবতারসূচিতমস্যাভিরামত্বং প্রমদবনস্য—দেখ, নববসন্তের সূচনাস্বরূপ প্রমোদ বনের শোভা। রাজা বল্লেন—আমি তো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি চারিধারে।

অগ্রে স্ত্রী-নখ পাটলং কুরবকং শ্যামং দ্বয়োর্ভাগয়ো
বালাশোকমুপোঢ়রাগসুভগং ভেদোন্মুখং তিষ্ঠতি।
ঈষদ্বদ্ধরজঃ-কণাগ্রকপিশা চূতে নবা মঞ্জরী
মুগ্ধত্বস্য চ যৌবনস্য সখে মধ্যে মধুশ্রীঃ স্থিতা॥ ৪৯॥

নারীর নখের ডগার মতন রক্তিম কুরবক, দুধারে সবুজ আঁকা,
নবীন অশোকে রাঙা পল্লব প্রস্ফুট মনলোভা,
হল রক্তিম সহকার-শাখা মুকুল-পরাগ-মাখা,
যৌবন-মুগ্ধতা দুঁহু মাঝে রাজে বসন্ত-শোভা।

বসন্তের ছবি অংকনে কালিদাস কুরবককে বারে বারে স্মরণ করেছেন। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের ষষ্ঠ অংকে দুষ্মন্তের রাজধানীতে বসন্ত-বর্ণনায় কালিদাস কুরবককে ভোলেন নি। বসন্ত এসেছে তবু উৎসবের চিহ্ন নেই রাজপ্রাসাদে কিম্বা প্রমোদ-কাননে। রাজার আদেশে সব উৎসব বন্ধ। দুটি সখি প্রমোদ কাননে বেড়াতে এলো। আমের মুকুল দেখে এক সখি মুকুল তুলে কন্দর্পের পূজা করতে অধীরা। মুকুল তুলে মদনকে স্মরণ করে মুকুল ছড়াচ্ছে এমন সময় রাজার কঞ্চুকীর প্রবেশ। ক্রুদ্ধ কঞ্চুকী বল্লে—মা তাবদনাত্মজ্ঞে! দেবেন প্রতিষিদ্ধে বসন্তোৎসবে ত্বমাম্রকলিকাভঙ্গং কিমারভসে।--মহারাজের নিষেধ বসন্তোৎসব হবে না। তুমি কোন্ সাহসে আমের মুকুল ছিঁড়ছো? মেয়েদুটি ভয়ে ভয়ে জানালো যে তারা জান্তো না মহারাজের নিষেধ। কঞ্চুকী বল্লে—দেখছো না যে গাছ পাখী সব মহারাজের নিষেধ মেনে চল্‌ছে ঃ—

চূতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বং রজঃ।
সন্নদ্ধং যদপি স্থিতং কুরবকং তৎ কোরকাবস্থয়া।
কণ্ঠেষু স্খলিতং গতেঽপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতং
শঙ্কে সংহরতি স্মরোঽপি চকিতস্তূণার্দ্ধকৃষ্টং শরম্॥ ১৩॥

আম্র-মুকুল কবে দেখা দেছে, নাহি পরাগের লেশ,
প্রস্ফুট-প্রায় কুরবকগুলি কুঁড়ি হয়ে থেকে গেলো,
কোকিল-কণ্ঠে সুর বেধে গেলো, যদিও শীতের শেষ,
মদনের তূণে আধো-বার-করা সায়কটি ফিরে এলো।

পনেরো—কুটজ

কুটজ বর্ষার ফুল। কালো মেঘের দিকে মুখ তুলে ফোটে কুটজের শাদা ফুল। কুটজ হচ্ছে আমাদের কুর্চি ফুল। 'মেঘদূতম্'-এ পূর্বমেঘ খণ্ডে কুটজেব দেখা আমরা দুবার পাই। মেঘকে তো খুশি করতে হবে, তবে তো সে যক্ষের বারতা নিয়ে যাবে অলকায় যক্ষ-প্রিয়ার কাছে। তাই ঃ-

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যম্ প্রবৃত্তিম্।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার॥ ৪॥

আষাঢ় ঘনালে বাঁচাতে প্রিয়ারে বিরহ-দহন হতে,
মেঘ দিয়া নিজ কুশল-বারতা পাঠাইতে অভিলাষী
নবপ্রস্ফুট কুটজ কুসুমে করি পূজা বিধিমতে
স্বাগত জানালো আষাঢ়ের মেঘে যক্ষ সে পরবাসী।

মেঘ তো কুর্চিফুলের নৈবেদ্য পেয়ে তুষ্ট হয়ে যক্ষের বারতা নিয়ে চল্‌লো অলকাপুরীর দিকে। বিরহী বন্ধুর বারতা তার প্রিয়াকে যত শীঘ্র সম্ভব পৌঁছে দেবার সদিচ্ছেও মেঘের ছিলো। কিন্তু শীঘ্র যেতে ইচ্ছে থাকলেই কি যাওয়া যায় শীঘ্র? অলকায় যাবার পথে মন টানবার যে কতো কী আছে? তাই যক্ষ মেঘকে সাবধান করে দিচ্ছে ঃ—

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্বতে পর্বতে তে।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদ্যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ॥ ২২॥

ত্বরা করি সখা চাহ যাইবারে আমার প্রিয়ার তরে,
তবু কাল যাবে গিরিতে গিরিতে কুটজ ফুলের টানে,
কেকাধ্বনি করি স্বাগত জানাবে ময়ূর সজল-আঁখি,
ত্বরা করি কভু যাওয়া চলে যবে শিখীরা নয়ন হানে?

'রঘুবংশম্'-এর একোনবিংশ সর্গে নৃপতি অগ্নিবর্ণ-এর রাজত্বকালের বর্ণনা

আছে। নৃপতি অগ্নিবর্ণ ছিলেন বীর্যহীন বিলাসী পুরুষ। রাজকার্য ছেড়ে তিনি পুরকামিনীদের নিয়েই দিন কাটাতেন। বর্ষা ঋতু এলে ক্রীড়া-শৈলেতে গিয়ে বিহার করতেন ঃ—

অংসলম্বিকুটজার্জুনস্রজস্তস্য নীপরজসাঙ্গরাগিণঃ ।
প্রাবৃষি প্রমদবর্হিণেষ্বভূৎ কৃত্রিমাদ্রিষু বিহারবিভ্রমঃ ॥ ৩৭ ॥

কুটজ কুসুম-অর্জুন ফুলে রচিত মাল্য গলে,
কদম ফুলের পরাগে রঙীন নৃপতির কলেবর,
যেথায় আসিত মদ-ভরপুর ময়ূরেরা দলে দলে,
বর্ষা আসিলে সে ক্রীড়া-শৈলে যাপিতেন নৃপবর ।

বর্ষা এসেছে। বিলাসিনীদের মনে কতো আনন্দ। প্রিয়ের প্রতীক্ষায় সাজছে তারা কতো ছাঁদে। কদম্ব যেমন তাদের প্রিয়, তেমনি কুটজ। 'ঋতুসংহারম্'-এর দ্বিতীয় সর্গে বর্ষা বর্ণনায় মহাকবি বলছেন ঃ-

"মালাঃ কদম্ব-নব-কেশর-কেতকীভি-
রায়োজিতাঃ শিরসি বিভ্রতি যোষিতোঽদ্য ।
কর্ণান্তরেষু ককুভ-মঞ্জরীভি-
রিচ্ছানুকূল-রচিতানবতংসকাংশ্চ ॥ ২০ ॥

কদম বকুল কেতকী কুসুমে গাঁথিয়া মোহন মালিকা
বিলাসিনীদল আজি কুন্তলে বাঁধে,
কুটজ কুসুম-মঞ্জরী লয়ে রচি বিচিত্র আভরণ
পরিতেছে তারা কর্ণে কত না ছাঁদে ।

ষোল—নীপ—কদম্ব

কদম্বের আদর ছিলো প্রাচীন ভারতে, কিন্তু সে আদর ছিলো কদম্বের ভুবন-ভোলানো সৌন্দর্যের আদর। কদম তখনো সাত্ত্বিক হয়ে ওঠে নি ভক্তির আবিলতায়! মহাকবিকে মুগ্ধ করেছিল কদম। তাঁর নানা কাব্যে বর্ষার বর্ণনায় কদমের আবির্ভাব। কালিদাস কিন্তু নীপ ও কদম্ব এই দুটি ফুলের কথা একই শ্লোকে ব্যবহার করেছেন ঃ—

মুক্তবা কদম্ব-কুটজার্জুন-সর্জ-নীপান সপ্তচ্ছদানুগতা কুসুমোদ্গমশ্রীঃ ।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে নীপ ও কদম্ব এদুটি ফুলকে তিনি এক করে দেখেন নি। নীপ আর কদম এক জাতের হলেও তারা ঠিক এক নয়। এই পার্থক্য-টুকু কালিদাসের কবিতা থেকেই ধরা পড়ে। দুইয়ের মধ্যে যে কি পার্থক্য তা আমাদের জানা নেই। তবে মহাকবিরা যা বলেন তা আর্ষ হলেও গ্রাহ্য। তাই মহাকবি-নির্দিষ্ট এদের পার্থক্য স্বীকার করে নিতেই হবে। কিন্তু এরা দোঁহে দোঁহার এতোই কাছাকাছি যে একসঙ্গে গেঁথে না দিলে এদের মনে ব্যথা দেওয়া হবে।

'মেঘদূতম্'-এর পূর্বমেঘ খণ্ডে মেঘের অলকা-যাত্রার মনোহারিণী বর্ণনা করেছেন কালিদাস। আম্রকূট পাহাড় পার হয়ে মেঘ চললো বিন্ধ্যপর্বতের দিকে। অতোটা পথ চলায় মেঘের তো পথশ্রান্ত হবার কথাই। তাই শ্রান্ত মেঘ বন্যহস্তীদের গণ্ড থেকে নিঃসারিত মদধারা-মিশ্রিত ঝরণার জল পান করে তৃষ্ণা দূর করবে। তার পরে যে পথ দিয়েই মেঘ যাবে সেখানে তার বর্ষণে ফুল ফুটতে সুরু করবে। বর্ষা কাল। বর্ষার কদম্ব কি মেঘের স্পর্শ না পেয়ে পারে ঃ-

নীপং দৃষ্টা হরিতকপিশং কেশরৈরর্ধরূঢ়ৈরাবির্ভূত-প্রথম মুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্ ।
জগ্ধ্বারণ্যেষ্বধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্বাঃ সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্ ॥ ২১ ॥

শ্যাম-পাংশুলে নীপের কেশর ফুটে ওঠে চঞ্চল,
ভুঁইচাপাদলে প্রথম মুকুল বরিষণ-উদ্গত,
নিহারিবে নীপে হরিণহারিণী, খাবে তারা চাঁপা কলি,
সিক্ত মাটির আঘ্রাণ নেবে, দেখাবে তোমারে পথ ।

এম্‌নি করে শ্যাম জম্বুবনের উপর দিয়ে সিক্ত কেতকীর গন্ধ আঘ্রাণ করে। নানা জনপদের উপর দিয়ে মেঘ একদিন পৌঁছবে অলকায়। অলকার পুরনারীরা সাজ্‌তে জানে। তাই তাদের প্রসাধনের অন্যতম উপাদান হচ্ছে নীপ।

হস্তেলীলাকমলমলকং বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥ ২ ॥

বধূদের হাতে লীলার কমল, কুন্দ কুসুম অলকে
পাণ্ডু আননে আনিয়াছে শ্রী লোধ্র-রসের ঝলকে ।
বেণীতে তাদের নব কুরবক কর্ণে শিরীষ অতুল,
সীঁথিতে তাদের বর্ষার দূতী নব কদম্ব দোদুল ।

রতি-মদন-বসন্ত তিনজনে মিলে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করতে এসেছেন। অপেক্ষা করে আছেন উমার। উমা এলেন, হাতে তাঁর মন্দাকিনী থেকে নিজে হাতে তোলা পদ্ম-বীচির মালা? সেই মালা নিবেদন করবেন ধ্যানী শঙ্করের চরণে। এ সুযোগ কি কন্দর্প-রতি-বসন্ত ছাড়তে পারেন? পার্বতীর হাত থেকে মালাটি নেবার জন্যে শঙ্কর যেই হাত বাড়ালেন অমনি মদন তাঁর পুষ্পধনুতে 'অমোঘ' সম্মোহন বাণ জুড়লেন। তখন উমার কি হোলো তার বর্ণনা করেছেন কালিদাস 'কুমারসম্ভবম্-এর

তৃতীয় সর্গে ঃ—

বিবৃন্বতী শৈলসুতাপিঃ ভাবসঙ্গেঃ স্ফুরদ্ বালকদম্বকল্পৈঃ ।
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ মুখেন পর্যস্ত-বিলোচনেন ॥ ৬৮ ॥

উমার পরাণে ভাবের বিকার উপজিল সেই ক্ষণে
নব কদম্ব সম দেহে জাগে রোমাঞ্চ অনুপম,
মুখ ফিরাইয়া আনত নয়নে রহে উমা উপবনে,
দাঁড়ায়ে রহিল শিবের সমুখে স্থির আলেখ্য সম ।

'রঘুবংশম্'-এর একোনবিংশ সর্গে নৃপতি অগ্নিবর্ণ-এর ক্রীড়া-শৈল-বিহারের বর্ণনা করে মহাকবি বলছেন ঃ—

অংসলম্বিকুটজার্জুনস্রজস্তস্য নীপরজসাঙ্গরাগিণঃ ।
প্রাবৃষি প্রমদবর্হিণেষ্বভূৎ কৃত্রিমাদ্রিষু বিহারবিভ্রমঃ ॥ ৩৭ ॥

কুটজ কুসুম-অর্জুন ফুলে রচিত মাল্য গলে,
কদম ফুলের পরাগে রঙীন নৃপতির কলেবর,
যেথায় আসিত মদ-ভরপুর ময়ূরেরা দলে দলে,
বর্ষা আসিলে সে ক্রীড়া-শৈলে যাপিতেন নৃপবর ।

'ঋতু-সংহারম্'-এ দ্বিতীয় সর্গে বর্ষা বর্ণনায় কদম্ব ও নীপ বার বার দেখা দিয়েছে। বর্ষা ঋতুতে নারীরা বর্ষার ফুল-আভরণে সাজছে ঃ—

কদম্বসর্জার্জুনকেতকীবনং প্রকম্পয়ংস্তৎকুসুমাধিবাসিতঃ ।
স-শীকরাম্ভোধরসঙ্গশীতলঃ সমীরণঃ কং ন করোতি সোৎসুকম্ ॥ ১৭ ॥

বনে উপবনে শাল-কদম্ব-অর্জুন-কেতকীরে
কাঁপায় আজিকে সুরভিত সমীরণ,
আজি বরষায় জলভরা-মেঘ-পরশে শীতল বায়ু
করে উৎসুক কার না বিরহী মন ।

এই নব-বর্ষায় নারীরা কদম্বের আভরণ পড়ছে ঃ—

"মালাঃ কদম্ব-নব-কেশর-কেতকীভি-
রায়োজিতাঃ শিরসি বিভ্রতি যোষিতোঽদ্য ।
কর্ণান্তরেষু ককুভ-মঞ্জরীভি-
রিচ্ছানুকূল-রচিতানবতংসকাংশ্চ ॥ ২০ ॥

কদম বকুল কেতকী কুসুমে গাঁথিয়া মোহন মালিকা
বিলাসিনীদল আজি কুন্তলে বাঁধে,
কুটজ কুসুম-মঞ্জরী লয়ে রচি বিচিত্র আভরণ
পরিতেছে তারা কর্ণে কত না ছাঁদে ।

নববর্ষার ধারায় বনস্থলীর সমস্ত তাপ দূর হয়েছে, তার আনন্দের আর অবধি নেই ঃ—

মুদিত ইব কদম্বৈর্জাতপুষ্পৈঃসমন্তাৎ পবনচলিত-শাখৈঃ শাখিভির্নৃত্যতীব।
হসিতমিব বিধত্তে সূচিভিঃ কেতকীনাং নবসলিলনিষেকোচ্ছিন্নতাপো বনান্ত॥ ২৩॥

নব বারিধারে প্রশমিত আজি বনানীর তপজ্বালা,
বনানীর দেহে রোমাঞ্চ সম ফুটেছে কদম ফুল,
কেয়া-মঞ্জরী ফুটেছে যেন গো হাসিতেছে বনতল,
পবনে দুলিছে তরুশাখা যেন বনানী নৃত্যাকুল।

শুধু কি বনস্থলী সেজেছে বর্ষার ফুলে? নারীরাও আজ সেজেছে বকুলের সঙ্গে মালতী ও যূথী মেশানো মালা পরে, কাণে দিয়েছে নবকদম্বের আভরণ ঃ—

শিরসি বকুলমালাং মালতীভিঃ সমেতাং
বিকসিত নবপুষ্পৈর্যূথিকাকুট্মলৈশ্চ।
বিকচনবকদম্বৈঃ কর্ণপূরং বধূনাং
রচয়তি জলদৌঘঃ কান্তবৎ কাল এষ॥ ২৪॥

বনফুল যূথী মালতীর সাথে বকুল মালিকাখানি
প্রিয়জন সম সোহাগে ভরিয়া মন,
বধূদের কালো চিকণ অলকে সাজায় বর্ষাঋতু,
কর্ণে পরায় প্রস্ফুট নবকদম্ব-আভরণ।

বর্ষা চলে গেছে, এসেছে শরৎ। বর্ষার ফুল কদম আর কুর্চি ফুটছে না। তাই পঞ্চশর তার পূর্বের আশ্রয় ত্যাগ করে সপ্তপর্ণ তরুতে নতুন আশ্রয় নিয়েছে। 'ঋতুসংহারম্' এর তৃতীয় সর্গে শরৎ-বর্ণনায় কবি বলছেন ঃ—

নৃত্যপ্রয়োগ-রহিতাঞ্ছিখিনো
বিহায় হংসানুপৈতি মদনো মধুর-প্রগীতান।
মুক্ত্বা সদম্ব-কুটজার্জুন-সর্জ্জ-নীপান্
সপ্তচ্ছদানুপতা কুসুমোদ্গমশ্রীঃ॥ ১৩॥

করে না নৃত্য আর ময়ূরেরা তাই তাহাদেরে ত্যজি,
মধুর-কণ্ঠ মরালের কাছে গিয়াছে পঞ্চশর,
কদম-কুটজ-শাল-অর্জুনে ত্যজিয়া শারদ-শোভা
ফুলে ফুলে ভরা সপ্তপর্ণ পানে ধায় সত্বর।

সীতাকে রাবণ হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গেছেন। বিরহ-দুঃখে রাম কাতর। আগে যা তাঁকে আনন্দ দিতো, তাই তাঁকে আজ দুঃখ দেয়। 'রঘুবংশম্'-এর ত্রয়োদশ

সর্গে রাম তাঁর সেই বিরহ-বেদনা জানাচ্ছেন ঃ—

গন্ধশ্চ ধারাহত-পল্বলানাং কাদম্বমর্দ্ধোদ্‌গত-কেসরঞ্চ ।
স্নিগ্ধাশ্চ কেকাঃ শিখিনাং বভূবুর্যস্মিন্নসহ্যানি বিনা ত্বয়া মে॥ ২৭॥

সিক্ত মাটির মধুর গন্ধ বরিষা-ধারায় নব,
আধো-ফোটা সব কদম-মুকুল পরিয়াছে নব-সাজ,
বারি-বর্ষণে সুখ-বিহ্বল ময়ূরের কেকা-রব,
তোমার বিহনে সকলি হে প্রিয়ে অসহ হয়েছে আজ ।

কদম-মুকুলের সঙ্গে চোখের জলের বড় বড় ফোঁটার তুলনা সুন্দর তো বটেই, অভিনবও। দিব্য বিমান এসে উপস্থিত, রাম স্বর্গে চল্‌লেন। প্রজারা চোখের জলে তাঁর যাত্রা-পথ সিক্ত করেছে। 'রঘুবংশম্‌'-এর পঞ্চদশ সর্গে তার বর্ণনা করেছেন কালিদাস ঃ—

জগৃহুস্তস্য চিত্তজ্ঞাঃ পদবীং হরিরাক্ষসাঃ ।
কদম্বমুকুলৈঃ স্থূলৈরভিবৃষ্টাং প্রজাশ্রুতি॥ ৯৯॥

কদম-মুকুল সম বড়ো বড়ো অশ্রুর ফোঁটা ঝরে,
প্রজাদের আঁখিজলধারে হোলো পথখানি নির্মল,
চলিলেন রাম আঁখিজলেভেজা সেই পথখানি ধরে,
চলিল সে পথে রামের ভক্ত কপি-রাক্ষসদল ।

নৃপতি পুরূরবা উর্বশীর বিরহে পাগল প্রায়। যা দেখেন তাই তাঁকে উর্বশীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উপবনে হরিণকে দেখে তাকেই উর্বশীর কথা জিজ্ঞেস করছেন। ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন রক্ত-কদম্ব তরু। মনে পড়ে গেলো অতীতের একটি দিনের কথা। 'বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্‌'-এর চতুর্থ অঙ্কে কালিদাস পুরূরবার এই অবস্থার মনোহারিণী বর্ণনা দিয়েছেন ঃ—

রক্তকদম্বঃ সোহয়ং প্রিয়য়া ঘর্ম্মান্তশংসি যস্যোদম্‌ ।
কুসুমমসমগ্রকেশর-বিষমমপি কৃতং শিখাভরণম্‌॥ ৬০॥

এই সেই তরু রক্ত-কদম অতি-পরিচিত মোর,
নিদাঘ-অন্তে আধো-প্রস্ফুট কদমের ফুল নিয়া,
মাথার ভূষণ রচিত প্রেয়সী হয়ে আনন্দে ভোর,
সাজিতো প্রেয়সী কালো কেশে তার কদম-কুসুম দিয়া ।

সতেরো—কেতকী

নদীর তীরে নেহাৎ অযতনে জন্মায় কাঁটার বর্ম-পরা কেতকীর ঝোপ। তার ফুল সেও কাঁটার সাঁজোয়া পরে লুব্ধ পথিককে দূরে রাখতে ব্যস্ত। হৃদয়ের মধু সে দিতে চায় না কাউকে, কাঁটা দিয়ে আগ্‌লে রাখে পরাণের মধু-সঞ্চয়। বাঙলার কবি,

কেয়া ফুলের প্রেমিক তিনি। কেন কেয়া কাঁটা দিয়ে মধু ঢেকেছে, কার অভিসারে সে বের হয়েছে, নিজেকে লুকিয়ে তাঁর সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া চলছে কেয়ার—এ সব কবির জানা আছে; কেয়ার-এ সব গোপন কথা তিনি ফাঁস করে দিয়েছেন। বাঙলার কবি রূপের তরী দিয়ে অরূপের ঘাটে পোঁচেছেন। উজ্জয়িনীর কবি রূপের ঘাটে তাঁর যাওয়া-আসা দেহজ সৌন্দর্যের খেয়া বেয়ে। কেতকীর কেশরে বিলাসিনীরা কেশ সুরভিত করে, তাই তাকে অনাদর করা চলে না। তাই কেতকীর কথা এসেছে কালিদাসের কাব্যে।

'মেঘদূতম্'-এর পূর্বমেঘ খণ্ডে মেঘের অলকা যাত্রার বর্ণনা করেছেন কবি। যখন মেঘ নানা পথে চলে দশার্ণ-তে গিয়ে পৌঁছবে তখন কেতকীর বেড়া-দেওয়া উপবন তার নজরে পড়বে। মেঘের পরশনে কেতকীর মুকুল ধরবে ঃ—

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈঃ ।
নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফল-শ্যাম-জম্বূবনান্তাঃ,
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়ি-হংসা দশার্ণাঃ॥ ২৩॥

বনের প্রান্তে মেঘ-ছায়ে ফোটে কেতকীর কুঁড়িগুলি,
হবে পাখীদের নীড়-রচনায় মুখর গ্রামের পথ,
রবে দর্শানে মরালেরা কিছু কাল মানসেরে ভুলি,
ধারা পেলে হবে জম্বু-কানন শ্যাম ফলভারে নত ।

হরপার্বতীর মান-অভিমানের লীলা বর্ণনা করেছেন কালিদাস কুমারসম্ভবম্-এর অষ্টম্ সর্গে। শিবের উপর পার্বতী অভিমান করেছেন। পূজা বন্দনা নিয়ে অনেকটা সন্ধ্যে নষ্ট করেছেন শিব। এমন সন্ধ্যে বেলাটা এমনি করে নষ্ট করতে হয়! শিব ভোলাবার চেষ্টা করছেন পার্বতীর মন—দেখ, পার্বতী, সন্ধ্যের অন্ধকার ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে, সন্ধ্যা যেন লুটিয়ে পড়ছে পৃথিবীর উপরে। মনে হচ্ছে যেন গেরুয়া নদী বয়ে চলেছে আর তার তটভূমিতে ঘননীল তমাল তরু। অন্ধকার ঢেকে ফেলেছে পৃথিবীকে। দেখ, পার্বতী, দেখ ঃ—

পুণ্ডরীকমুখি! পূর্ব্বদিঙ্মুখং কৈতকৈরিব রজোভিরাহতম্॥ ৫৮॥
নূনমুন্নমতি যজ্বনাং প্রিয়ঃ শার্ব্বরস্য তমসো নিষিদ্ধয়ে ।

কমল-আননা প্রিয়া হের ঐ চন্দ্রমা উঠিতেছে,
যাজ্ঞিকদের প্রিয় নিশানাথ নিশার আঁধার নাশে,
প্রাচী-দিগ্-বধূ-মুখখানি, হের, কে যেন রাঙায়ে দেছে,
কেতকী-পরাগে রাঙায়ে আনন দিগ্-বধূ যেন হাসে ।

নৃপতি রঘুর সঙ্গে অন্য রাজাদের যুদ্ধ চলছে। সেই যুদ্ধ হচ্ছে মুরলা

নদীর ধারে। সেই নদী ধারে কেতকীর বন। 'রঘুবংশম্'-এর চতুর্থ সর্গে সেই দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন কালিদাস ঃ—

মুরলামারুতোদ্ধূতমগমৎ কৈতকং রজঃ।
তদ্‌যোধ-বারবাণানামযত্ন-পটবাসতাম॥ ৫৫॥

মুরলা নদীর তীরেতে রয়েছে ঘন কেতকীর বন,
কেতকী-পরাগ পবনের বেগে নভতলে উড়ে যায়,
রঘুর সেনার দেহপরে হয় কেয়া-রেণু-বর্ষণ
ঝরিল পরাগ অযাচিত-পাওয়া গন্ধচূর্ণ প্রায়।

ইন্দুমতীর স্বয়ংবর। স্বয়ংবর সভায় নানা দেশের নৃপতিরা সমাসীন। ইন্দুমতীকে পাওয়ার আশায় কতো না তাদের বিলাস-বিভ্রম, কতো না ছলাকলা! কোনো রাজা হাতের লীলা-কমল ঘুরাতে লাগলেন, কেউ বা স্থান-চ্যুত কণ্ঠহারটি যথাস্থানে সাজাতে ব্যস্ত, কেউ বা অঙ্গুলি বাঁকা করে স্বর্ণময় পাদপীঠে কি যেন লিখ্‌তে লাগলেন। এই রকম এক রাজার বর্ণনা করে রঘুবংশম্-এর ষষ্ঠ সর্গে কালিদাস বল্‌ছেন ঃ—

বিলাসিনী-বিভ্রম-দন্ত-পত্রমাপাণ্ডুরং কেতকবর্হমন্যঃ।
প্রিয়া-নিতম্বোচিত-সন্নিবেশৈর্বিপাটয়ামাস যুবা নখাগ্রৈঃ॥ ১৭॥

প্রিয়ার জঘনে পরমানন্দে যে নখর হানে যুবা,
সে নখর দিয়ে ছিন্ন করিছে কেতকীর পল্লব,
হলুদ-বরণ যে কেতকী দিয়ে রচে বিলাসিনীদল
পরম সোহাগে কানের ভূষণ অপরূপ অভিনব।

'ঋতুসংহারম্' কাব্যে বর্ষা-বর্ণনায় কেতকী উপেক্ষিতা হয় নি, তবে নিজের গৌরবে, না যে বিলাসিনীদের ভূষণ রচনা করেছে কেতকী, তাদের দৌলতে তার এই সমাদর কবির কাছে, তা বলা শক্ত। তবে কেতকী-কেশর তার নিজ ঐশ্বর্যে নারীদের হিয়া লুটে নিচ্ছে, এমন কথাও কবি বলেন নি যে তা নয় ঃ—

নবজলকণসঙ্গাচ্ছীততামাদধানঃ
কুসুমভরনতানাং লাসকঃ পাদপানাম্।
জনিতরুচিরগন্ধঃ কেতকীনাং রজোভিঃ
পরিহরতি নভস্বান্ প্রোষিতানাং মনাংসি॥ ২৬॥

নবজলধারা বর্ষণ করি তাহার তীক্ষ্ণ ঘাতে
কুসুমের ভারে আনত তরুরে নাশিয়া,

কেতকী-রেণুর পরশে বৃষ্টি ঘন সৌরভময়
লুণ্ঠিয়া লয় আজি নারীদের হিয়া।

শুধু তাই না ঃ—

মুদিত ইব কদম্বৈর্জাতপুষ্পৈঃসমন্তাৎ পবনচলিত-শাখৈঃ শাখিভির্নৃত্যতীব।
হসিতমিব বিধত্তে সূচিভিঃ কেতকীনাং নবসলিলনিষেকচ্ছিন্নতাপো বনান্তঃ॥ ২৩॥

নব বারিধারে প্রশমিত আজি বনানীর তাপজ্বালা,
বনানীর দেহে রোমাঞ্চ সম ফুটেছে কদম ফুল,
কেয়া-মঞ্জরী ফুটেছে যেন গো হাসিতেছে বনতল,
পবনে দুলিছে তরুশাখা যেন বনানী নৃত্যাকুল।

এমন যে কেয়া-মঞ্জরী সে যদি বরবর্ণিনীদের কাজে না আসে তো তার ফোটাই বৃথা ঃ—

মালাঃ কদম্ব-নব-কেশর-কেতকীভি-
রাযোজিতাঃ শিরসি বিভ্রতি যোষিতোঽদ্য।
কর্ণান্তরেষু ককুভদ্রুম-মঞ্জরীভি-
রিচ্ছানুকূল-রচিতানবতংসকাংশ্চ॥ ২০॥

কদম বকুল কেতকী কুসুমে গাঁথিয়া মোহন মালা
বিলাসিনীদল আজি কুন্তলে বাঁধে,
কুটজ ফুলের মঞ্জরী লয়ে রচি বিচিত্র আভরণ
পরিতেছে তারা কর্ণে কতো না ছাঁদে।

আঠারো—অশোক

'পাদাহতঃ প্রমোদয়া বিকশত্যশোকঃ'—সে কালে অশোক ফুল ফোটাতো নারীর চরণাঘাতে। তখন নারীদের পায়ে জুতো ওঠে নি, কুমুদের পাঁপড়ির মতো শুভ্র চরণদুটির প্রান্তদেশ রাঙা হোতো অলক্তকে। সে চরণের পরশনে অশোক কি কখনো ফুল না ফুটিয়ে পারে! একালেও অশোক ফুল ফোটায় কিন্তু সে আধুনিকাদের হিলওয়ালা-জুতো-পরা ত্রিভংগ চরণের স্পর্শে নয়। এদের চরণের স্পর্শে ফুল ফোটে না, ফুল শুকিয়ে যায়, ঝরে পড়ে।

অশোক যে শুধু সেকালের বরাংগনাদের প্রিয় ফুল ছিলো তা নয়, কালিদাসেরও প্রিয় ফুল ছিলো অশোক। তাঁর কাব্যে অশোক বার বার দেখা দিয়েছে। মেঘদূতম্-এর উত্তর মেঘ খণ্ডে মহাকবি বলছেন ঃ—

রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরুবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য।

একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদন-মদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ॥ ১৭॥

সেথা রক্ত-অশোক বকুলেতে নব-পল্লব-শিহরণ,
মাধবীকুঞ্জ বিরাজে সেথায় কুরবকবীথিমাঝে,
অশোক সে চায় তোমার সখির বামপদপরশন,
ফুল ফোটাবার ছলেতে বকুল মুখের মদিরা যাচে।

'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'-এর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে অশোকের উল্লেখ রয়েছে বহুবার। তৃতীয় সর্গের প্রারম্ভেই দেখি পরিচারিকা সমাহিতিকা বল্ছে—"এষা তপনীয়াশোকমবলোকয়ন্তী মধুকরিকা তিষ্ঠতি। যাবদেনাং সম্ভাবয়ামি॥ ১॥

রক্ত অশোক তরুর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মধুকরিকা। যাই, তাঁর সঙ্গে আলাপ করি গিয়ে। দুই সখিতে আলাপ চল্লো। দাড়িম্ব ফল নিয়ে সমাহিতিকা গমনোদ্যতা। তখন মধুকরিকা বল্লেন—"সখি! সমমেব গচ্ছাবঃ। অহমপ্যস্য চিরায়মাণকুসুমোদ্গমস্য তপনীয়াশোকস্য দোহদনিমিত্তং দেব্যৈ নিবেদয়ামি॥ ১০॥" "সখি! একটু দাঁড়াও, একসঙ্গে যাবো দুজনে। এই অশোক তরুতে ঠিক সময়ে ফুল ফোটে নি। আমি দেবীর কাছে গিয়ে অশোক তরুর দোহদ দেবার জন্যে আবেদন করবো।"

নৃপতি অগ্নিমিত্র বিদূষকের সঙ্গে উদ্যানে ভ্রমণ করছেন, এমন সময়ে মালবিকা এলেন সেই উদ্যানে। মালবিকা নিজের মনে নিজেকে সম্বোধন করে কতো না কথা বল্ছেন। প্রিয়তমকে অভিলাষ করে শুধু বেদনাই পেয়েছেন আর পেয়েছেন লজ্জা। এই সব কথা ভাবছেন, হঠাৎ মনে পড়ে গেলো দেবীর আদেশ—"আং আদিষ্টাস্মি দেব্যা,—গৌতমচাপলাদ্ দোলা-পরিভ্রষ্টয়া সরুজো মম চরণঃ। ন শক্যোমি। ত্বং তাবদ্ গত্বা তপনীয়াশোকস্য দোহদং নিবর্ত্তয় ইতি"॥ ৩১॥ "আঃ, মনে পড়েছে। দেবী আমাকে আদেশ করে বলেছেন—"বিদূষকের চপলতায় দোলা থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে বড়ো ব্যথা পেয়েছি। তাই তুমি গিয়ে অশোক তরুর দোহদ সম্পন্ন করে এসো।"

উদ্যানে ঘুরতে ঘুরতে নজরে পড়লো অশোক তরু। মালবিকা—"অয়ং স সুকুমারদোহদাপেক্ষী অগৃহীত-কুসুম-নেপথ্য উৎকণ্ঠিতায়া মম অশোকঃ অনুকরোতি। যাবদস্য প্রচ্ছায়শীতলে শিলাপট্টকে নিষণ্ণা আত্মানং বিনোদয়ামি।" "এই সেই অশোক তরু। সুকুমার দোহদের অপেক্ষায় ফুলহীন এই অশোক আমারই মতো যেন কার অপেক্ষা করে আছে। যাই, ওর ছায়াতলে শিলাফলকে বসে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিই।"

প্রমোদ-কাননে নৃপতি অগ্নিমিত্র বেড়াচ্ছেন প্রিয় বয়স্য বিদূষককে নিয়ে।

বসন্ত-লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের তারিফ করে বিদূষক বল্লেন যে সুন্দরীদের প্রসাধন-কলা বসন্ত-লক্ষ্মীর প্রসাধননৈপুণ্যের কাছে হার মেনে যায়। অগ্নিমিত্র বল্লেন যে বিদূষকের কথা খুবই ঠিক। তিনি অবাক হয়ে দেখছেন বসন্ত-লক্ষ্মীর সৌন্দর্য—

রক্তাশোকরুচা বিশেষিতগুণো বিম্বাধরালক্তকঃ
প্রত্যাখ্যাতবিশেষকং কুরবকং শ্যামাবদাতারুণম্ ।
আক্রান্তা তিলকক্রিয়াপি তিলকৈর্লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনৈঃ
সাবজ্ঞেব মুখপ্রসাধনবিধৌ শ্রীর্মাধবী যোষিতাম্॥ ৩০॥ (৩য় অংক)

রক্ত অশোক নারী-অধরের লালিমা-গর্ব হরে,
শ্যাম-শ্বেত-লাল কুরবক দেয় পত্রলেখারে লাজ,
ললাট-তিলকে তিলক ফুলের অলি-শোভা ম্লান করে,
হতমান হোলো সুন্দরীদের প্রসাধন-কলা আজ ।

মালবিকা প্রমোদকাননে বসে আছেন, সেখানে চরণের ভূষণ নিয়ে প্রবেশ করলো বকুলাবলিকা। মালবিকাকে বল্লো বকুলাবলিকা—সখি, একটি চরণ বাড়িয়ে দাও, আমি আল্তা দিয়ে পাখানি রাঙিয়ে নূপুর পরিয়ে দিই।

মালবিকা নীরব হয়ে কি করে সাজ-সজ্জা থেকে পরিত্রাণ পাবেন তাই ভাবতে লাগলেন। মালবিকাকে নীরব দেখে বকুলাবলিকা বল্লো—"কিং বিচারয়সি? উৎসুকা খলু অস্য তপনীয়াশোকস্য কুসুমোদ্গমে দেবী॥ ৫৭॥ কি ভাব্‌ছো সখি? এই রক্ত অশোকে ফুল ফোটাবার জন্যে দেবী বড়ই উৎসুক হয়ে আছেন।" নৃপতি আড়াল থেকে দুই সখির কথোপকথন শুনছিলেন। তিনি বিদূষককে জিজ্ঞাসা করলেন—কথমশোকদোহদনিমিত্তোঽয়মারম্ভঃ?—অশোক তরুর দোহদের জন্যেই কি এ সব ব্যাপার? বকুলাবলিকা মালবিকার কোনো আপত্তিই শুন্‌লো না, পাদুটিতে আল্তা পরিয়ে নূপুর দিয়ে সাজাতে লাগ্‌লো। এই দেখে বিদূষক বল্লেন যে মালবিকার সুন্দর চরণদুটির প্রসাধন করে যোগ্য কাজই করছে বকুলাবলিকা। রাজা বল্লেন—বয়স্য, তুমি ঠিকই বলেছ।

নবকিসলয়রাগেণাগ্রপাদেন বালা স্ফুরিতনখরুচা দ্বৌ হন্তুমর্হত্যনেন ।
অকুসুমিতমশোকং দোহদাপেক্ষয়া বা প্রণিমিতশিরসং বা কান্তমার্দ্রাপরাধম্॥ ৬৪॥

নবকিশলয় সম আরক্ত প্রিয়া-পদ অনুপম,
ধবল-নখর-কিরণে চরণ উজ্জ্বল মনোহর,
দোহদ-প্রার্থী নি-ফুল অশোক, অপরাধী প্রিয়তম,
প্রিয়াই যোগ্য চরণ-আঘাত হানিতে দোঁহার পর॥

'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'-এর চতুর্থ অঙ্কে বেদনা-ক্লিষ্টা শয্যাশায়িনী দেবীর কাছে রাজা গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে হঠাৎ আর্তস্বরে চীৎকার-রত বিদূষকের প্রবেশ— রক্ষা কর প্রভু, রক্ষা কর। দেবীকে শূন্য হাতে দর্শন করতে নেই, তাই ফুল তুল্তে গিয়েছিলুম, সাপে দংশন করেছে—তত্র অশোকস্তবককারণাৎ প্রসারিতঃ দক্ষিণহস্তঃ। ততঃ কোটর-বিনির্গতেন সর্পরূপিণা কালেন দষ্টোঽস্মি। ননু এতে দ্বে দংশন-পদে॥ ৪৮॥ উপবনে অশোক ফুল তোলবার জন্যে ডান হাতটি প্রসারিত করেছিলুম। অম্নি কোটর থেকে বের হয়ে সর্প-রূপী কাল আমাকে দংশন করলো। এই দেখ দুটি দাঁতের চিহ্ন।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর পঞ্চম অঙ্ক সুরু হোলো উদ্যানপালিকাকে নিয়ে। উদ্যানপালিকা—উপক্ষিপ্তোমন্না সংস্কারবিধিনা তপনীয়াশোকস্য বেদিকাবন্ধঃ। যাবৎ অনুষ্ঠিতনিয়োগম্ আত্মানং দেব্যৈ নিবেদয়ামি। অহো দৈবস্য অনুকম্পনীয়া মালবিকা। তস্যাং তথা চণ্ডিকা দেবী অনেন অশোক-কুসুম-দোহদ-বৃত্তান্তেন প্রসাদোন্মুখী ভবিষ্যতি॥ ১॥ "দোহদের যে সব বিধান আছে সেই সব সংস্কার অনুযায়ী আমি রক্ত-অশোকের বেদী-রচনা করেছি। এখন দেবীকে খবর দিই গিয়ে। মালবিকার উপর দৈবের কি অনুগ্রহ! মালবিকার উপর দেবী এতো ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন, কিন্তু অশোক তরুর দোহদের সংবাদ পেলেই তিনি প্রসন্না হবেন।"

উদ্যানপালিকা চলে যাবার পরেই প্রতীহারীর প্রবেশ। প্রতীহারী—আজ্ঞপ্তা অস্মি দেব্যা অশোকসৎকারব্যাপৃতয়া,—বিজ্ঞাপয় আর্য্যপুত্রম্। ইচ্ছামি আর্য্যপুত্রেণ সহ অশোকবৃক্ষকস্য প্রসূনলক্ষ্মীং প্রত্যক্ষীকর্ত্তুম্॥ ১১॥

প্রতিহারী—অশোক তরুর সৎকারে ব্যাপৃতা দেবী আমাকে আদেশ করেছেন— আর্যপুত্রকে বলো গিয়ে যে আমি তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে অশোকতরুর কুসুমশোভা দেখতে ইচ্ছা করি।"

রাজার কাছে গিয়ে প্রতিহারী বল্লো—"জয়তু জয়তু দেবঃ। দেবী বিজ্ঞাপয়তি, তপনীয়া-শোকস্য কুসুমোদ্গমশ্রিয়ম্ আর্য্যপুত্রেণ সহ প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছামি ইতি॥ ২০॥ "জয় হোক মহারাজের। দেবী আপনাকে জানিয়েছেন যে তিনি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে রক্তাশোক তরুতে যে ফুল ফুটেছে তা দেখতে বাসনা করেন।"

নৃপতি সানন্দে সম্মতিজ্ঞাপন করে বিদূষককে নিয়ে প্রমোদবনে বিচরণ করতে লাগলেন।

বিদূষক বল্লেন—অহো! অয়ং সঃ দত্ত-নেপথ্যঃ ইব কুসুম-স্তবকৈঃ তপনীয়া-শোকঃ। আলোকয়তু ভবান্॥ ২৭॥ "অহো! গুচ্ছ গুচ্ছ কুসুমে অশোক তরুকে কে যেন সাজিয়ে রেখেছে। দেখুন মহারাজ।"

রাজা বল্লেন—যথা সময়ে এই অশোক তরুতে ফুল না ফুটে ভালোই হয়েছে, নইলে এর এমন অনন্যসাধারণ শোভা হোতো কি করে? দেখ :—

সর্ব্বশোকলতানাং প্রথমং সূচিতবসন্তবিভবানাম্।
নির্বৃত্তদোহদেঽস্মিন্ সংক্রান্তানীব মুকুলানি॥ ২৮॥
মনে হয় এই অশোক তরুর দোহদ হয়েছে সারা
সকল অশোকে বসন্ত-শোভা সূচিত হওয়ার পর,
সকল অশোক তরুর মুকুল তাই গো আত্মহারা
এই অশোকেতে ফুটিয়া উঠেছে অপরূপ মনোহর।

বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্-এর চতুর্থ অঙ্কে কালিদাস উর্বশী-বিরহ-কাতর নৃপতি পুরূরবার বিরহাবস্থার কমনীয় ছবি এঁকেছেন। স্বর্গের এক সরোবরতীরে চিত্রলেখা ও সহজন্যা উর্বশীর বিরহে সন্তপ্তা হয়ে বিলাপ-রতা। সেই সরোবর-তীরে উর্বশী-অন্বেষণ-রত রাজা পুরূরবা এসে হাজির। পাগলের মতো তিনি যা কিছু দেখছেন তাকেই উর্বশীর কথা জিজ্ঞাসা করছেন। বিদ্যুৎকে উর্বশী বলে ভ্রম করে ধরতে যাচ্ছেন। ময়ূরকে দেখে, কোকিলকে দেখে উর্বশীর সন্ধান তারা জানে কিনা শুধোচ্ছেন। হংসবলাকা মানস-গমনে উৎসুক, রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করছেন উর্বশীর সন্ধান। রক্তকদম্ব দেখে পুরূরবার মনে হোলো যে তিনি এতোদিনে তাঁর প্রেয়সীর পথের সন্ধান পেয়েছেন। অকস্মাৎ নজরে পড়লো পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে থেকে রক্তবর্ণ কি একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে। একবার মনে হোলো ওটা হয়তো সিংহ কর্তৃক খণ্ডিত হাতীর শুঁড়ের রক্তাক্ত একটি অংশ অথবা আগুনের ফুলকি। তারপরে ভ্রম বুঝতে পারলেন রাজা—অয়ে! রক্তাশোকস্তবকসমরাগো মণিরয়ং যমুদ্ধর্তুং পূষা ব্যবসিত ইবালম্বিতকরঃ॥ ৮৪॥—ওঃ বুঝেছি, রক্তবরণ অশোক ফুলের মতো রক্তিম একটি মণি। সেই মণি থেকেই এই প্রভা বিকীর্ণ হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই মণিটিকে ধরবার জন্যে সূর্য তাঁর কিরণ-রূপ হস্ত প্রসারিত করেছেন।

কুমারসম্ভবম্-এর তৃতীয় সর্গে অশোকের দেখা পাই। মহাদেব যে তপোবনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন, মদন, বসন্ত ও রতি যখন সেখানে প্রবেশ করলেন তখন নিমেষের মধ্যে সেই তপোবনের চেহারা বদল হয়ে গেলো—

অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ
স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি।
পাদেন নাপৈক্ষত সুন্দরীনাং
সম্পর্কমাসিঞ্জিত নূপুরেন॥ ২৬॥

ফোটালো অশোক অসংখ্য ফুল অকাল বসন্তে,
শাখামূলে হতে কিশলয়ে ফুলে অশোক উঠিল ভরে,
সুন্দরীদের নূপুর-মুখর চরণ-পরশ লাগি
অপেখিতে নাহি হোলো অশোকেরে ফুল ফুটাবার তরে।

উমা যখন মহাদেবের অর্চনা করবার জন্যে তাঁর তপোবনে যাবার সংকল্প করলেন তখন নানা ফুলের আভরণে নিজেকে সাজিয়েছিলেন। রক্তিম অশোক ফুল উমার দেহে আভরণ হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয় নি—

অশোকনির্ভর্ৎসিতপদ্মরাগমাকৃষ্টহেমদ্যুতি কর্ণিকারম্ ।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী॥ ৫৩॥

অশোক ফুলে পদ্মরাগ মাণিক হোলো লাঞ্ছিত
কর্ণিকার নিলো সোনার স্থান,
সিন্ধুবার রাজিলো যেথা মুকুতা হতো বাঞ্ছিত
ফাগুন-কুসুম দিল দেহে অবদান ।

ঋতুসংহারম্-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ-শোভা-বর্ণনায় অশোক বাদ পড়েনি—

শ্যামালতাঃ কুসুমভারনতাপ্রবালাঃ
স্ত্রীণাং হরন্তি ধৃতভূষণ বাহু কান্তিম্ ।
দন্তাবভাসবিশদস্মিত চন্দ্রকান্তিং
কঙ্কেলিপুষ্পরুচিরা নবমালতী চ॥ ১৮॥

নবকিশলয় কুসুমের ভারে নুয়ে-পড়া শ্যামালতা,
তার কাছে হারে রমণী-বাহুর আভরণ-পরা শোভা,
অশোক কুসুম নব-বিকশিত ফুল্ল মালতী ফুল
হরিতেছে আজ নারীর হাসির কান্তি চিত্ত-লোভা ।

বসন্তের দিনেও অশোক নারী-দেহের সঙ্গলাভে বঞ্চিত নয়। ঋতুসংহারম্-এর ষষ্ঠ সর্গে বসন্তবর্ণনায় কবি বলছেন ঃ—

কর্ণেষু যোগ্যং নবকর্ণিকারং
চলেষু নীলেষ্বলকেষ্বশোকম্ ।
পুষ্পঞ্চ ফুল্লম্ নবমল্লিকায়াঃ
প্রয়াতি কান্তি প্রমদাজনস্য॥ ৫॥

নারীর কর্ণ-ভূষণ-যোগ্য কুসুম কর্ণিকার,
ঘন কালোকেশ-ভূষণ অশোক ফুল,
নবমল্লিকা তরুটি ভরিয়া ফোটে যে কুসুম শোভা
রূপে ভরে এরা নারীর দেহের কূল ।

অশোক শুধু রূপের সাজে সাজায় না নারীদের, তাদের অন্তরে স্মৃতি জাগিয়ে বিরহের অনলে দগ্ধ করে তাদের হিয়া—

আ মূলতো বিদ্রুমরাগতাম্রং,
সপল্লবাঃ পুষ্পচয়ং দধানাঃ ।
কুর্ব্বন্ত্যশোকা হৃদয়ং সশোকং
নিরীক্ষ্যমাণা নব যৌবনানাম্ ॥ ১৬ ॥

প্রবালের মতো রক্তবরণ কুসুমে মোহন সাজি,
অশোক শ্যামল-পল্লব-সুশোভিত,
নবযৌবনা রমণীরা যবে হেরিছে অশোক পানে
বেদনার রসে ভরিছে তাদের চিত ।

'রঘুবংশম্'-এর অষ্টম্ সর্গে অজ বিলাপ করছেন ইন্দুমতীর মৃত্যুতে ঃ—

কুসুমং কৃত দোহদস্তয়া যদশোকোঽয়মুদীরয়িষ্যতি ।
অলকাভরণং কথং নু তত্তব নেষ্যামি নিবাপমাল্যতাম ॥ ৬২ ॥

চরণ-আঘাতে দোহদ করিলে যে অশোকে তুমি প্রিয়া
যে অশোক ফুলে রচিতে তোমার কবরীর আভরণ,
সে অশোক তরু নবকুসুমেতে উঠিবে উচ্ছ্বলিয়া,
সেই ফুল-মালা রচিবে কি তব অন্তিম আবরণ!

স্মরতেব সশব্দনূপুরং চরণানুগ্রহমন্যদুর্লভম্ ।
অমুনা কুসমাশ্রুবর্ষিণা ত্বমশোকেন সুগাত্রি শোচ্যসে ॥ ৬৩ ॥

চেয়ে দেখো প্রিয়া ঐ সে অশোক বিকশিত নবলোকে
তোমার নূপুর-রণন-মুখর চরণ-পরশ স্মরি
অশ্রুবিন্দু করিতেছে ত্যাগ তোমার বিরহ-শোকে
দুর্লভ তব চরণ-পরশ-স্মৃতি আছে হিয়া ভরি ।

রঘুবংশম্-এর নবম সর্গে অযোধ্যায় বসন্তের আবির্ভাবের বর্ণনা করে কালিদাস বলছেন ঃ—

কুসুমমেব ন কেবলমার্ত্তবং নবমশোকতরোঃ স্মরদীপনম্ ।
কিসলয়প্রসবোঽপি বিলাসিনাং মদয়িতা দয়িতাশ্রবণার্পিতঃ ॥ ২৮ ॥

নবপ্রস্ফুট অশোক কুসুম নববসন্তদিনে
শুধু সে-ই নাহি জাগায় কামেরে সকলের অন্তরে
প্রিয়ার কর্ণে শোভে অশোকের যে রঙীন কিশলয়
সেই কিশলয় উন্মাদনায় বিলাসীর হিয়া ভরে ।

ঊনিশ—মন্দার পারিজাত সন্তানক

হরিচন্দন, কল্পতরু, মন্দার, পারিজাত ও সন্তানক—এই পাঁচটি হচ্ছে স্বর্গের নন্দনবনের দেবতরু। কালিদাসের রচনায় স্বর্গের বর্ণনা রয়েছে নানা কাব্যে ও নাটকে। তাই নন্দনের ফুলগুলি কবির কল্পনার স্রোত বেয়ে নেমে এসেছে তাঁর কাব্যের মধ্যে। পাঁচটি দেবতরুর মধ্যে তিনটি দেবতরুর ফুলের সন্ধান পাই মহাকবির রচনায়। হরিচন্দন ও কল্পবৃক্ষের উল্লেখ আছে তাঁর রচনায়, কিন্তু তাদের ফুলের কথা নেই তাঁর কাব্যে।

মেঘদূতম্-এর উত্তর মেঘ খন্ডে অভিসারিকাদের অভিসারের বর্ণনা করে যক্ষ মেঘকে বল্ছেন ঃ—গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ

গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ
পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈঃ
নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম॥ ১১॥

চলার বেগেতে কেশ হতে ঝরে পড়ে পথে মন্দার,
ঝরে কর্ণের স্বর্ণকমল, বুকের পত্রলেখা,
লুটায় ধুলায় মুক্তার জাল, ছিন্ন কণ্ঠ-হার,
প্রভাতেব বুকে অভিসারিকার শর্বরী-লীলা লেখা।

কুমার সম্ভবম্-এর পঞ্চম সর্গে পার্বতী শিবের মহাত্ম্য বর্ণনা করে বল্ছেন ঃ—

অসম্পদস্তস্য বৃষেণ গচ্ছতঃ প্রভিন্ন-দিগ্বারণ-বাহনো বৃষা।
করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা বিনিদ্রমন্দাররজোহরুণাঙ্গুলী॥ ৮০॥

বৃষ চড়ি যবে পথ চলে যান দরিদ্র শঙ্কর
গজ হতে নামি প্রণমে ইন্দ্র শিবের চরণে লুটি
প্রণতির কালে ইন্দ্র-মুকুটে শোভে যেই মন্দার,
তার পরাগেতে রঞ্জিত হয় শিবের চরণদুটি।

কুমারসম্ভবম্-এর ষষ্ঠ সর্গে বর্ণনা আছে আকাশ-গঙ্গা মন্দাকিনীর। সপ্তর্ষিরা শিবের তপোবনে আসছেন মন্দাকিনীর কি অপূর্ব শোভা! ঃ—

আপ্লুতাস্তীর-মন্দার-কুসুমোৎকির-বীচিষু।
ব্যোমগঙ্গাপ্রবাহেষু দিঙনাগমদগন্ধিষু॥ ৫॥

তীর হতে উড়ে আসে নদীবুকে মন্দার ফুলদল,
মন্দাকিনীর ঊর্মির বুকে ফুলদল খেলা করে,
দিঙনাগদের মদবারি-ঝরা সুগন্ধ নদী-জল,
তাহে স্নান করি সপ্ত ঋষিরা আসেন শিবের তরে।

রঘুবংশম্-এর ষষ্ঠ সর্গে কালিদাস ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের ছবি এঁকেছেন। স্বয়ংবর সভায় ইন্দুমতীর সখি সুনন্দা এক এক করে রাজাদের পরিচয় দিচ্ছেন ইন্দুমতীকে। রাজা পরন্তপের পরিচয় দিয়ে সুনন্দা বলছেন ঃ—

ক্রিয়াপ্রবন্ধাদয়মধ্বরাণামজস্রমাহূতসহস্রনেত্রঃ ।
শচ্যাশ্চিরং পাণ্ডুকপোললম্বান্মন্দারশূন্যানলকাংশ্চকার ॥ ২৩ ॥

যজ্ঞের পর যজ্ঞ করিতে নৃপতি পরন্তপ,
ইন্দ্রের ডাক পড়িতো নিত্য যজ্ঞের সভাতলে,
শচীর পাণ্ডু কপোলের পরে যে অলক দুলে মরে,
মন্দার ফুল আর শোভেনাকো হায় সেই কুন্তলে ।

রাজা পুরুরবা সৌরলোক থেকে আকাশ-পথে নিজের রাজধানীতে ফিরে আসছেন। পথে নারীর ক্রন্দন শুনে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে কেশি নামক দানব উর্বশীকে হরণ করে নিয়ে গেছে তাই সখিরা কাঁদছে। রাজা পুরুরবা উর্বশীকে উদ্ধার করলেন দানবের হাত থেকে। দানবের হাত থেকে রক্ষা পাবার পরেও উর্বশীর যে বিকল অবস্থা, তার বর্ণনা করেছেন কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্-এর প্রথম অংকে ঃ--

মন্দারকুসুমদাম্না গুরুরস্যাঃ সূচ্যতে হৃদয়কম্পঃ ।
মুহুরুচ্ছ্বসতা মধ্যে পরিণাহবতোঃ পয়োধরয়োঃ ॥ ৩৫ ॥

পয়োধর-মাঝে কেঁপে কেঁপে ওঠে মন্দার মালাখানি,
পরাণ কাঁপিছে থর থর তাহে সহজেই অনুমানি ।

উর্বশীর বিরহে পাগল প্রায় হয়ে নৃপতি পুরুরবা তাঁর সন্ধানে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্-এর চতুর্থ অংকে বিরহ-কাতর পুরুরবার বর্ণনা করেছেন কালিদাস। একটি অপরূপ মণি পেয়েছেন পুরুরবা। সেই মণিটি নিয়ে তিনি বিলাপ করছেন ঃ--

মন্দারপুষ্পৈরধিবাসিতায়াং যস্যাঃ শিখায়াময়মর্পণীয়ঃ ।
সৈব প্রিয়া সম্প্রতি দুর্লভা মে নৈবৈনমশ্রুপহতং করোমি ॥ ৬৩ ॥

মন্দার ফুল-শোভিত প্রিয়ার সুন্দর সীঁথিপরে
এই মণিখানি সাজাতে সোহাগে আমার পরাণ চায়,
সেই প্রিয়া মোর দুর্লভ আজ, আর তো পাবো না ওরে,
শুধু আঁখিজলে এই মণিখানি মলিন করিনু হায় ।

স্বর্গ থেকে মর্তে আসছেন রাজা দুষ্মন্ত। স্বর্গে দেবরাজ তাঁকে কতো সমাদরে

অভ্যর্থনা করেছেন, তাঁর সিংহাসনের আধখানিতে দুষ্মন্তকে বসিয়ে কী প্রীতিই না তাঁকে দেখিয়েছেন—এই সব বর্ণনা করে দুষ্মন্ত মাতলিকে বলছেন ঃ—

অন্তর্গত প্রার্থনামন্তকস্থং জয়ন্তমুদ্বীক্ষ্য কৃতস্মিতেন ।
আমৃষ্টবক্ষো হরিচন্দনাঙ্কা মন্দার মালা হরিণা পিনদ্ধা ॥ ৩ ॥
হরিচন্দন-চর্চিত বুকে শোভে মন্দার মালা ।
চন্দন-মাখা মন্দারমালা কণ্ঠ হইতে খুলি
পরালেন মোর গলে দেবরাজ মালিকা সোহাগ-ঢালা ।
মালা-অভিলাষী জয়ন্ত পানে হাসি-ভরা মুখ তুলি ।

উমার বিবাহের দিন ওষধিপ্রস্থনগর অভিনব সাজে সেজেছে। কুমারসম্ভবম্-এর সপ্তম্ সর্গে নগাধিরাজ হিমালয়ের রাজধানী ওষধিপ্রস্থ নগরের বর্ণনা করে কবি বলছেন ঃ—

সন্তানকাকীর্ণমহাপথং তচ্চীনাংশুকৈঃ কল্পিতকেতুমালম্ ।
ভাসোজ্জ্বলৎকাঞ্চনতোরণানাং স্থানান্তরং স্বর্গ ইবাবভাসে ॥ ৩ ॥

চীনাংশুকের পতাকা মালায় সজ্জিত হোলো পথ,
হোলো রাজপথ সন্তান তরু কুসুমেতে সমাকীর্ণ,
স্বর্ণতোরণে উজ্জ্বল হোল নগরীর রাজপথ,
মনে হোল যেন স্বর্গ হয়েছে ধরাতলে অবতীর্ণ ।

রামের জন্মক্ষণে দেবতারা আকাশ থেকে সন্তানক-কুসুমের পুষ্প-বৃষ্টি করলেন। রঘুবংশম্-এর দশম সর্গে তার বর্ণনা আছে ঃ—

সন্তানকময়ী বৃষ্টির্ভবনে চাস্য পেতুষী
সন্মঙ্গলোপচারাণাং সৈবাদিরচনাভবৎ ॥ ৭৭ ॥

আকাশ হইতে রাজপুরী পরে ঝরে সন্তান ফুল,
সন্তান-তরু-পুষ্প-বৃষ্টি স্বর্গ হইতে ঝরে,
রামের জন্ম ক্ষণে দেবতারা আনন্দে সমাকুল
সর্বপ্রথমে শুভ উপচারে তার বন্দনা করে ।

কুমারসম্ভবম্-এর অষ্টম সর্গে মহাদেব নিজ হাতে পার্বতীকে কেমন করে পারিজাত কুসুম দিয়ে সাজাতেন তার বর্ণনা করেছেন কবি ঃ—

তাং পুলোমতনয়ালকোচিতৈঃ পারিজাতকুসুমৈঃ প্রসাধয়ন্ ।
নন্দনে চিরমযুগ্মলোচনঃ সস্পৃহং সুরবধূভিরীক্ষিতঃ ॥ ২৭ ॥

শচীর অলকে শোভিত নিত্য যে মোহন পারিজাত
সেই পারিজাতে সাজাতেন শিব গৌরীরে নিজ হাতে.
সুরবধূদল তাকায়ে দেখিত আকুল কামনা সাথ,
নন্দনবনে ভ্রমিতেন শিব যবে গৌরীর সাথে।

পুরুরবা বয়স্য বিদূষককে নিয়ে ঘুরছেন, এমন সময়ে অন্তরীক্ষ থেকে উর্বশীর লিপি এসে পড়লো তাঁর সামনে। বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্-এর দ্বিতীয় অঙ্কে সেই লিপির বর্ণনা করেছেন কবি ঃ--

স্বামিন্! সম্ভাবিতা যথাহং ত্বয়া অজ্ঞাত্রী
তথা চানুরক্তস্য সুভগ এবমেব তব।
অনন্তরং চ মে ললিতপারিজাতশয়নীয়ে
ভবন্তি সুখা নন্দনবনবাতা অপি শিখীব শরীরে॥ ১০১॥

বুঝি নি তোমার হৃদয়ের কথা ভাবিয়াছ অনুখন.
আমারও প্রাণের বাসনা বোঝ নি সদা ভেবেছিনু আমি,
তাই পারিজাত ফুলের শয্যা নন্দনসমীরণ,
অগ্নিশিখার দহনে জ্বলেছে দেহমন দিনযামী।

কুড়ি—কোবিদার

কোবিদারের পরিচয় দিতে গিয়ে অমরকোষরচয়িতা বলেছেন—কোবিদারে চমরিকঃ কুদ্দালো যুগ্মপত্রকঃ অর্থাৎ কোবিদার জোড়া-পাতার গাছ. ফুলগুলি তার রোমের মতো। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞদের মতে একালের কাঞ্চন সেকালের গুরুগম্ভীর কোবিদার নাম নিয়ে উজ্জয়িনীর রাজসভায় নিজের স্থান করে নিয়েছিল। ঋতু-সংহারম্-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ-বর্ণনায় কোবিদারের প্রাণ-ভোলানো রূপের কথা ছন্দোবদ্ধ হয়েছে ঃ--

মন্দানিলাকুলিতচারুতরাগ্রশাখঃ পুষ্পোদ্‌গমপ্রচয়কোমলপল্লবাগ্রঃ
মত্তদ্বিরেফপরিপীতমধুপ্রসেকশ্চিত্তং বিদারয়তি কস্য ন কোবিদারঃ॥ ৬॥

মন্দপবনে মৃদু-কম্পিত শাখার অগ্রগুলি
নব কিশলয়ে কুসুমে মোহন সাজি
মত্তভ্রমরে মধুদানে রত কোবিদার তরুগুলি
করে বিদীর্ণ কার না চিত্ত আজি!

একুশ—শিলীন্ধ্রা

শিলীন্ধ্রা ধরণীর বুক বিদীর্ণ করে ফোটে নবধারাবর্ষণে। শিলীন্ধ্রা ও কন্দলী, আমাদের ভূঁইচাপার রাজকীয় দুটি নাম।

মেঘদূতম্-এর পূর্বমেঘ খণ্ডে যে পথ দিয়ে মেঘ কৈলাসে যাচ্ছে সেই পথে দুবার ভূঁইচাপার দেখা পাই ঃ—

কর্ত্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং
তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জ্জিতং মানসোৎকাঃ।
আকৈলাসাৎ বিস-কিসলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ
সম্পৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ॥ ১১॥

মেঘগর্জনে ফোটে ভূঁইচাপা ধরণীর বুক চিরে,
হংসবলাকা মেঘগর্জনে মানসের লাগি মাতি
মৃণাল-পাথেয় লয়ে যবে ধায় মানস-সরসীতীরে
কৈলাসগিরিযাত্রী তোমার হবে মরালেরা সাথী।

শুধু কি তাই? মেঘবর্ষণে হরিতকপিশ নীপকেশর দেখা দেবে নীপবনে, তাই দেখে ভূঁইচাপাকলি রোমন্থন করতে করতে হরিণ-হরিণীরা বনতলে ঘুরে বেড়াবে ঃ—

নীপং দৃষ্টবা হরিতকপিশং কেশরৈরর্ধরূঢ়ৈ
রাবির্ভূত প্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।
জগ্ধ্বারণ্যেষ্বধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্ব্যাঃ
সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্॥ ২১॥

হেরি হরিতকপিশ নীপের কেশর প্রস্ফুট অম্লান,
নব-প্রস্ফুট ভূঁইচাপা-কলি সুখে চর্বণ-রত,
হরিণ-হরিণী নেয় আনন্দে সিক্ত মাটির ঘ্রাণ,
দেখায় তাহারা বর্ষণ-ধারা-সিক্ত তোমার পথ।

রঘুবংশম্-এর ত্রয়োদশ সর্গে লংকা থেকে সীতাকে নিয়ে রামের অযোধ্যায় ফিরে আসবার ছবি এঁকেছেন কালিদাস। পুষ্পকরথে চড়ে আসবার সময় রাম সীতাকে সব গিরি-নদী-বন ও জনপদের সঙ্গে পরিচিত করে দিচ্ছেন। কোথাও সমুদ্র, কোথাও বা পর্বত ঃ—

আসারসিক্তক্ষিতিবাষ্পযোগাৎ
মামক্ষিণোৎ যত্র বিভিন্নকোশৈঃ।
বিড়ম্ব্যমানা নবকন্দলৈস্তে
বিবাহধূমারুণলোচন-শ্রীঃ॥ ২৯॥

মাল্যবান গিরির শিখরে নবধারাবরিষণে
মৃত্তিকা হতে ধোঁয়ালি বাষ্প ওঠে আকাশের পানে,
ধোঁয়ালি বাষ্প মেশে যবে এসে লাল ভূঁইচাপা সনে,
বিবাহ-অগ্নি-ধূমে রক্তিম তব আঁখি মনে আনে।

রক্ত-বরণ ভুঁইচাপা সদ্যপ্রস্ফুট, ভুঁইচাপার মধ্যে বৃষ্টিবিন্দু টল্‌টল্‌ করছে। তাই দেখে বিরহী পুরুরবার উর্বশীর সজল রক্তিম নয়ন দুটি মনে পড়ে গেলো ঃ—

আরক্তকোটিভিরিয়ং কুসুমমৈর্নবকন্দলীমিলিনগর্ভৈঃ।
কোপদন্তর্বাষ্পে স্মরয়তি মাং লোচনে তস্যাঃ॥ ৩২॥

রক্তিম নবকন্দলীফুল মাঝে
বৃষ্টি-বিন্দু ধরেছে অমল শোভা,
স্মরণেতে আনে ক্রোধ-রক্তিম আঁখিদুটি প্রেয়সীর,
সজল নয়ন রক্তিম মনলোভা।

বাইশ—কর্ণিকার

বসন্তের ফুল কর্ণিকার। সেকালে নারীদের যে রুচি ছিলো তার পরিচয় তাঁদের প্রসাধন-কলার প্রতিটি আঙ্গিক থেকে পরিস্ফুট হোতো। ঝড়ের কালো মেঘে সোনালি বিদ্যুতের শোভাকে হার মানাবার জন্যে বুঝি বা কালো কেশে তাঁরা সোনালি কর্ণিকার পরতেন। এই কর্ণিকার বরণ-গরবে গরবী, সৌরভের দাবী তার নেই। আমাদের এই যন্ত্র-ঘর্ঘর যুগে কর্ণিকার পরুষ সোঁদাল নাম নিয়ে বিরাজমান। কুমারসম্ভবম্‌-এর তৃতীয় সর্গে কর্ণিকার ফুলের বর্ণনা করে কবি বল্‌ছেন ঃ—

বর্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং দুনোতি নির্গন্ধতয়া স্ম চেতঃ।
প্রায়েণ সামগ্রবিধৌ গুণানাং পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ॥ ২৮॥

বরণ-গরবে গরবী কর্ণিকার, নাহিকো গন্ধ, বেদন জাগায় মনে,
মনে হয় বুঝি বিশ্বস্রষ্টা সব গুণ দিতে নারাজ একটি জনে।

উমার দেহ সাজাতে নানা ফুলের ডাক পড়েছে। কর্ণিকার সেই গরবী ফুলদের অন্যতম। কুমারসম্ভবম্‌-এর তৃতীয় সর্গে উমার সাজের এই বর্ণনা আছে ঃ—

অশোকনির্ভর্ৎসিতপদ্মরাগমাকৃষ্টহৈমদ্যুতিকর্ণিকারম্‌।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী॥ ৫৩॥

অশোকফুলে পদ্মরাগ মাণিক হোলো লাঞ্ছিত,
কর্ণিকার নিলো সোনার স্থান,
সিন্ধুবার রাজিল যেথা মুকুতা হোতো বাঞ্ছিত,
ফাগুনের ফুল দিল দেহে অবদান।

সেই তৃতীয় সর্গেই শিবের চরণে প্রণতা উমার এই বর্ণনা করেছেন কালিদাস ঃ—

উমাপি নীলালকমধ্যশোভি বিস্রংসয়ন্তী নবকর্ণিকারম্‌।
চকার কর্ণচ্যুতপল্লবেন মূর্ধ্না প্রণামং বৃষভধ্বজায়॥ ৬২॥

মাথা নত করি প্রণমে শিবেরে যবে উমা গিরিসুতা,
তখন তাঁহার প্রণতির কালে হোলো এই অঘটন,
নীলকেশ হতে খসিয়া পড়িল নবীন কর্ণিকার,
কান হতে ঝরে পড়িল ধুলায় পল্লব-আভরণ ।

ঋতুসংহারম্-এর ষষ্ঠ সর্গে বসন্ত বর্ণনায় কর্ণিকার বার বার দেখা দিয়েছে ঃ—

কর্ণেষু যোগ্যং নবকর্ণিকারং চলেষু নীলেষ্বলকেষ্বশোকম্ ।
পুষ্পঞ্চ ফুল্লং নবমল্লিকায়াঃ প্রয়াতি কান্তিং প্রমদাজনস্য ॥ ৫ ॥

নারীর কর্ণ-ভূষণ-যোগ্য কুসুম কর্ণিকার
ঘন কালো কেশ-ভূষণ অশোক ফুল,
নবমল্লিকা তরুটি ভরিয়া ফোটে যে কুসুমদল,
রূপে ভরে দেয় নারীর দেহের কূল ।

কিং কিংশুকৈঃ শুক-মুখচ্ছবিভির্ন ভিন্নং কিং কর্ণিকার-কুসুমৈর্ন কৃতং নু দগ্ধম্ ।
যৎকোকিলঃ পুনরয়ং মধুরৈর্ব্বচোভির্যূনাং মনঃ সুবদনানিহিতং নিহন্তি ॥ ২০ ॥

শুকের চঞ্চু সম বঙ্কিম কিংশুক ফুলদল
যুবতীর হিয়া করে নি কি বিদীরণ ?
কর্ণিকার কি করে দগ্ধ নারীর কোমল হিয়া,
কোকিল আবার কেন করে নিপীড়ন ?

সমদমধুকরাণাং কোকিলানাঞ্চ নাদৈঃ
কুসুমিতসহকারৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ রম্যঃ ।
ইষুভিরিব সুতীক্ষ্ণৈর্মানসং মানিনীনাং
তুদতি কুসুমমাসো মন্মথোদ্দেবজনায় ॥ ২৭ ॥

মত্তভ্রমর-গুঞ্জন আর কোকিলকূজন-রবে
আম্রমুকুল ও কর্ণিকারের তীক্ষ্ণ সায়ক-পাশে,
নিতি ব্যথা হানে নব বসন্ত নারীর কোমল প্রাণে
প্রেমের দীপন জাগাবার অভিলাষে ।

রঘুবংশম্-এর নবম্ সর্গে বসন্তের বর্ণনা করে কবি বল্ছেন ঃ—

হুতহুতাশনদীপ্তি বনশ্রিয়ঃ প্রতিনিধিঃ কনকাভরণস্য যৎ ।
যুবতয়ঃ কুসুমং দধুরাহিতং তদলকে দলকেসরপেশলম্ ॥ ৪০ ॥

বনলক্ষ্মীর কনকাভরণ তার যেন প্রতিনিধি
আগুনের মতো উজল-দীপ্তি কুসুম কর্ণিকার,
প্রমোদ-মত্ত প্রমদাগণের চূর্ণ কেশের পরে
পরাইয়ে দিলো কর্ণিকার নব কিশলয় তার।

বিক্রমোর্বশীয়ম্-এর দ্বিতীয় অঙ্কে নিদাঘ দিনের বর্ণনায় দেখি ঃ—

উষ্ণার্ত্তঃ শিশিরে নিষীদতি তরোর্মূলালবালে শিখী
নির্ভিদ্যোপরি কর্ণিকারমুকুলান্যাশেরতে ষট্পদাঃ।
তপ্তং বারি বিহায় তীরনলিনীং কারণ্ডবঃ সেবতে
ক্রীড়াবেশ্মনি চৈষ পঞ্জরশুকঃ ক্লান্তো জলং যাচতে॥ ১৭৫॥

নিদাঘ তাপেতে কাতর ময়ূর তরু-আলবালে শুয়ে,
কর্ণিকারের কুঁড়িটি ফুটায়ে শোয় অলি তার পরে,
তপ্ত সলিল ত্যজি মরালেরা কমলের ছায়া খোঁজে,
প্রমোদ কক্ষে পিঞ্জরে শুক জল জল করে মরে।

বিক্রমোর্বশীয়ম্-এর তৃতীয় অঙ্কে এই বর্ণনাটি রয়েছে। রাজাকে আসতে দেখে কঞ্চুকী বলছে ঃ—

পরিজনবণিতাকরার্পিতাভিঃ।
পরিবৃত এষ বিভাতি দীপিকাভিঃ।
গিরিরিব গতিমানপক্ষসাদা-
দনুতটপুষ্পিতকর্ণিকারযষ্টিঃ॥ ১৮॥

দীপ হাতে সব অঙ্গনাদল ঘিরে চলে নৃপতিরে,
দীপ-উজ্জ্বল রাজ-দেহ মরি কি মোহন শোভা তার,
মনে হয় যেন অটুট-পক্ষ গিরি এক চলে ধীরে,
সানু দেশে তার ফুলভরে হাসে সোনালি কর্ণিকার।

তেইশ—বকুল

বকুল উপেক্ষিত হয় নি সত্যি কিন্তু বকুল তার পূর্ণ সমাদর লাভ করে নি মহাকবির কাছ থেকে। বিলাসিনীদের কাছে পেলবতার কিম্বা কোমলতার কি কোন কদর আছে?

রূপের উজ্জ্বলতা ও গন্ধের তীব্রতা তাদের মনোহরণ করে। বকুলের রূপ স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে প্রাণ ভরে দেয়, বকুলের যে গন্ধ বেদনার মতো প্রাণের প্রতিটি শিরাকে অবশ করে দেয়, সেই রূপ ও সেই গন্ধ কি বিলাসিনীদের ভালো লাগতে পারে!

উজ্জয়িনীর সুন্দরীরা মুখের মদিরা-সিঞ্চনে বকুল ফোটাতেন বটে কিন্তু সে নেহাৎ শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে, বকুলের প্রতি প্রাণের টানে নয়। কালিদাসও বকুলের অনুরাগী ছিলেন না। বকুল তার পূর্ণ মর্যাদা পাবার জন্যে বহু শতাব্দী অপেক্ষা করে ছিলো। সে গৌরব পেলো বকুল বিশ্বের আর এক মহাকবির কাছে— রবীন্দ্রনাথের কাছে। মেঘদূতম্-এর উত্তর মেঘে অলকায় তার বাড়ির বর্ণনা করে মেঘকে বল্ছে ঃ—

রক্তাশোকশ্চলকিসলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্ক্ষাত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মাস্যাঃ॥ ১৭॥

সেথা রক্ত-অশোক বকুলেতে নব-পল্লব-শিহরণ,
মাধবীকুঞ্জ বিরাজে সেথায় কুরবকবীথি মাঝে,
অশোক সে চায় তোমার সখির বামপদপরশন,
ফুল ফোটাবার ছলেতে বকুল মুখের মদিরা যাচে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর চতুর্থ অঙ্কে দুষ্মন্তের রাজধানীতে শকুন্তলার যাওয়ার বর্ণনা রয়েছে। শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের কাছে পাঠানো হচ্ছে। সখিরা মহা আনন্দে তাকে সাজাতে ব্যস্ত। অনসূয়া প্রিয়ম্বদাকে বল্ছে ঃ—তেন হি এতস্মিন্ চূতশাখাবলম্বিতে নারিকেলসমুদ্গকে এতন্নিমিত্তম্ এব কালান্তরক্ষমা নিক্ষিপ্তা ময়া কেশরমালিকা। তৎ ইমাং হস্তসন্নিহিতাং কুরু॥ ৪৫॥ "এই যে আম গাছে ঝোলানো নারিকেল পাতার তৈরী ঝাঁপিটা দেখ্ছো, ওর মধ্যে শকুন্তলার যাবার দিনে তাকে সাজিয়ে দেবো বলে এক গাছি বকুলের মালা রেখেছি। ঐ মালাটি নিয়ে এসো।"

উমা যাচ্ছেন তপস্যারত মহাদেবের তপোবনে। তপস্বীর মন ভোলাবার জন্যে সযতনে সেজেছেন পার্বতী। কুমারসম্ভবম্-এর তৃতীয় সর্গে আছে তার বর্ণনা ঃ—

স্রস্তাং নিতম্বাদবলম্বমানা পুনঃ পুনঃ কেশরদাম কাঞ্চীম্।
ন্যাসীকৃতাং স্থানবিদা স্মরেণ মৌর্বীং দ্বিতীয়ামিব কার্ম্মুকস্য॥ ৫৫॥

বকুলমালিকা চারুনিতম্বে রচেছে চন্দ্রহার,
খুলে খুলে পড়ে, হাত দিয়ে উমা ধরেন মালিকাখানি,
নিপুণ মদন আপন ধনুর দ্বিতীয় ছিলাটি তার
উমা-নিতম্বে রেখেছিল থুয়ে আপন ভাগ্য মানি।

পার্বতী মদিরা পান করেছেন। মহাদেব তখন পার্বতীকে বলছেন, কেন বৃথা

মদিরা পান! কুমারসম্ভবম্-এর অষ্টম্ সর্গে সেই মনোহর শ্লোকটি আছে :—

আর্দ্রকেশরসুগন্ধি তে মুখং রক্তমেব নয়নং স্বভাবতঃ।
অত্র লব্ধ বসতির্গুণান্তরং কি বিলাসিনি! মধু করিষ্যতি॥ ৭৬॥

সিক্ত-বকুল-সৌরভে-ভরা নিতি তব মুখখানি,
আঁখিদুটি তব অয়ি প্রিয়তমা স্বভাবত রক্তিম,
অয়ি বিলাসিনি! মদিরা তোমারে কি মাধুরী দিবে আনি,
যবে সকল সুষমা তোমার আননে নিঃশেষ নিঃসীম।

ঋতুসংহারম্-এর দ্বিতীয় সর্গে বর্ষা-বর্ণনায় বকুল দু-বার দেখা দিয়েছে :—

মালাঃ কদম্বনবকেশরকেতকীভিরায়োজিতাঃ শিরসি বিভ্রতি যোষিতোঽদ্য
কর্ণান্তরেষু ককুভদ্রুমমঞ্জরীভিরিচ্ছানুকূলরচিতানবতংসকাংশ্চ॥ ২০॥

কদমবকুলকেতকীকুসুমে গাঁথিয়া মোহন মালিকা
বিলাসিনীদল আজি কুন্তল বাঁধে,
অর্জুনফুলমঞ্জরী লয়ে রচি বিচিত্র আভরণ
পরিতেছে তারা কর্ণে কতো না ছাঁদে।

শিরসি বকুলমালাং মালতীভিঃ সমেতাং বিকসিতনবপুষ্পৈর্যূথিকাকুট্মলৈশ্চ।
বিকচনবকদম্বৈঃ কর্ণপূরং বধূনাং রচয়তি জলদৌঘঃ কান্তবৎ কাল এষঃ॥ ২৪॥

বনফুলযূথীমালতীর সাথে বকুলমালিকাখানি
প্রিয়জন সম সোহাগে ভরিয়া মন,
বধূদের কালো চিকণ অলকে সাজায় বর্ষা ঋতু
কর্ণে পরায় প্রস্ফুট নবকদম্ব আভরণ।

রঘুবংশম্-এর অষ্টম্ সর্গ। নৃপতি অজ ইন্দুমতীর জন্যে বিলাপ করছেন :—

তব নিঃশ্বসিতানুকারিভির্বকুলৈরর্ধাচিতাং সমং ময়া।
অসমাপ্য বিলাসমেখলাং কিমিদং কিন্নরকণ্ঠি! সুপ্যতে॥ ৬৪॥

তব নিঃশ্বাস সম সুগন্ধি বকুল কুসুম দিয়া
গাঁথিতে আছিনু দুজনে আমরা বিলাস-মেখলাখানি,
সেই মেখলাটি আধখানা গাঁথা, সারা হয় নাই প্রিয়া,
কেন প্রিয়া চিরনিদ্রার কোলে আপনারে দিলে আনি!

রঘুবংশম্-এর নবম্ সর্গে রমণীদের ললিত বিলাসবিভ্রমের ছবি এঁকেছেন কালিদাস ঃ—

ললিতবিভ্রমবন্ধবিচক্ষণং সুরভিগন্ধপরাজিতকেসরম্ ।
পতিষু নির্বিবিশুর্মধুমঙ্গনাঃ স্মরসখং রসখণ্ডনবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৬ ॥

ললিত বিলাস ও রতির বাসনা জেবলে দেয় অন্তরে
বকুলগন্ধ হয় পরাজিত যার গন্ধের কাছে,
কামনা-জাগানো এমন আসব রমণীরা পান করে,
প্রিয়তম সাথে প্রমদারা সুরা পান করে প্রেম যাচে ।

রঘুবংশম্-এর একোনবিংশ সর্গে কামোন্মত্ত নৃপতি অগ্নিমিত্র ও মদাকুলা অঙ্গনাদের বর্ণনা রয়েছে ঃ—

নাতিরেকমদকারণং রহস্তেন দত্তমভিলেষুরঙ্গনাঃ ।
তাভিরপ্যুপহৃতং মুখাসবং সোঽপিবদ্বকুলতুল্যদোহদঃ ॥ ১২ ॥

অগ্নিমিত্র-অধর হইতে কামনা-জাগানো সুরা
পান করিবারে ছিলো লালায়িত সুন্দরী নারীদল,
নারী-মুখ হতে সুরা পান তরে ছিলো হিয়া তৃষাতুরা,
বকুলের মতো দোহদপ্রার্থী নৃপতি কাম-বিকল ।

চব্বিশ—পিয়ালমঞ্জরী

পিয়াল-মঞ্জরীর সৌভাগ্য নেহাৎ কম নয়, সেও কবির কাব্যে স্থান পেয়ে গেছে। কুমারসম্ভবম্-এর তৃতীয় সর্গে হরিণদের হয়রাণির বর্ণনা করে কবি বল্ছেন ঃ—

মৃগাঃ পিয়ালদ্রুমমঞ্জরীণাং রজঃকণৈর্বিঘ্নিতদৃষ্টিপাতাঃ
মদোদ্ধতাঃ প্রত্যনিলং বিচেরুর্বনস্থলীমর্ম্মরপত্রমোক্ষাঃ ॥ ৩১ ॥

পিয়াল কুসুম-মঞ্জরী হতে পরাগ উঁড়িয়া আসি
হরিণদলের নয়নে পড়িয়া করে অন্ধের প্রায়,
পাগলের মতো ছোটে হরিণেরা বন-নিঝুমতা নাশি,
ঝরা-পল্লব-মর্মরধ্বনি বনতলে বেজে যায় ।

পঁচিশ—বন্ধুক, বন্ধুজীবক

সেকালের বন্ধুক, বন্ধুজীবক একালে বাঁধুলী নাম নিয়ে রয়েছেন আমাদের বনে উপবনে। কড়া সুরের দেবভাষার বন্ধুক, বন্ধুজীবকের চেয়ে আমাদের মানবীয়

ভাষার বাঁধুলী নামটি হাজারগুণ মিষ্টি। ফুলের নাম অতো কড়া সুরে কানে বাজলে চল্‌বে কেন! লাল টুক্‌টুকে মুখটি নিয়ে দেখা দেয় শরতের ফুল বন্ধুক।

মহাদেব পার্বতীকে নিয়ে বেড়াবার সময় তাঁকে সব চিনিয়ে দিচ্ছেন। কুমার-সম্ভবম্‌-এর অষ্টম্ সর্গে তার মনোহারিণী বর্ণনা আছে। মহাদেব বল্‌ছেন ঃ—

দূরমগ্নপরিমেয়রশ্মিনা বারুণী দিগরুণেন ভানুনা।
ভাতি কেশরবতেব মণ্ডিতা বন্ধুজীব-তিলকেন কন্যকা॥ ৪০॥

অস্তরবির কিরণেতে রাঙা পশ্চিম দিক হের,
কি মোহন শোভা ধরেছে বারুণী রঙীন আলোক-সাজে,
বাঁধুলী ফুলের দোদুল কেশর-তিলকে সাজিয়া যেন
নয়ন-ভোলানো সুন্দরী বালা মোদের সমুখে রাজে।

যজ্ঞের সময় রাক্ষসেরা নানা উৎপাত সুরু করে যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাতো। রঘুবংশম্‌-এর একাদশ সর্গে তার বর্ণনা রয়েছে ঃ—

বীক্ষ্য বেদিমথ রক্তবিন্দুভির্বন্ধুজীবপৃথুভিঃ প্রদূষিতাম্‌।
সম্ভ্রমোহভবদপোঢ়কর্ম্মণামৃত্বিজাং চ্যুতবিকঙ্কতস্রুচাম্‌॥ ২৫॥

বন্ধুক ফুল সম বড়ো বড়ো রক্তের ফোঁটা লেগে
যজ্ঞের বেদী মলিন হয়েছে দেখিলেন সভামাঝ,
দারুনির্মিত যজ্ঞপাত্র ভীষণ ভয়ের বেগে
হাত হতে খসে পড়িল, হইল বন্ধ সকল কাজ।

ঋতুসংহারম্‌-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ-বর্ণনায় বন্ধুক তিনবার দেখা দিয়েছে ঃ—
ভিন্নাঞ্জনপ্রচয়কান্তি নভো মনোজ্ঞং বন্ধুকপুষ্পরচিতারুণতা চ ভূমিঃ।
বপ্রাশ্চ পক্ককলমাবৃতভূমিভাগাঃ প্রোৎকণ্ঠয়ন্তি ন মনোভুবি কস্য যূনঃ॥ ৫॥

কাজলের মতো মনোহর কালো আজি অম্বরতল,
বাঁধুলি কুসুমে নবারুণ ধরাতল,
হের শতদলে সুশোভিত আজি বপ্রার তটভূমি,
তরুণ হৃদয় করে নাকি চঞ্চল?

অসিতনয়নলক্ষ্মীং লক্ষয়িত্বোৎপলেষু ক্বণিতকনককাঞ্চীং মত্তহংসস্বনেষু।
অধররুচিরশোভাং বন্ধুজীবে প্রিয়াণাং পথিকজন ইদানীং রোদিতি ভ্রান্তচিত্তঃ॥ ২৪॥

প্রিয়ার কমল-নয়নের শোভা নেহারিয়া শতদলে
মরাল-কূজনে আভরণ-ধ্বনি স্মরে,
বাঁধুলি কুসুমে হেরিয়া প্রিয়ার চারু অধরের শোভা
আজিকে বিরহী প্রবাসীরা কেঁদে মরে।

স্ত্রীণাং বিহায় বদনেষু শশাঙ্কলক্ষ্মীং কামঞ্চ হংসবচনং মণিনূপুরেষু।
বন্ধূককান্তিমধরেষু মনোহরেষু ক্বাপি প্রয়াতি সুভগা শরদাগমশ্রীঃ॥ ২৫॥

অতি সযতনে নারীর আননে থুইয়া চাঁদের শোভা,
মরালের ধ্বনি থুয়ে মণি-মঞ্জীরে,
বাঁধুলি ফুলের কান্তি সঁপিয়া চারু-অধরের পরে
শারদশ্রী মিলাইলো ধীরে ধীরে।

ছাব্বিশ—মালতী

বর্ষার ফুল মালতী শরতেও তার জের টেনে চলে। মালতীর মালা বিলাসিনী-দের বেণী-বন্ধনে ও কণ্ঠের শোভাবর্ধনে কাজে লাগ্‌তো দেখা যাচ্ছে। মেঘদূতম্‌-এর উত্তর মেঘে যক্ষ মেঘকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন পাছে মেঘ গর্জনে ও বিদ্যুৎ-স্ফুরণে নিদ্রিতা যক্ষ-প্রিয়াকে ভীত করে :—

তামুত্থাপ্য স্বজলকণিকাশীতলেনানিলেন প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জালকৈর্মালতীনাম্‌
বিদ্যুদ্‌গর্ভঃ স্তিমিতনয়নাং ত্বৎসনাথে গবাক্ষে বক্তুং ধীরঃ স্তনিতবচনৈর্মানিনীং
প্রক্রমেথাঃ॥ ৩৭॥

জাগায়ো প্রিয়ারে জলকণাবাহী সমীরণ-পরশনে,
মালতীর কুঁড়ি যথা ফুটে ওঠে ভোরের শীতল সমীরে,
করিও আলাপ অতি ধীরে ধীরে বিরহিণী প্রিয়া সনে,
ভয় যেন নাহি পায় প্রিয়া মোর, ঢেকে রেখো দামিনীরে।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্‌-এর তৃতীয় অঙ্ক। মালবিকাকে নিয়ে সমাহিতিকা ও মধুকরিকার আলাপ চল্‌ছে। পরচর্চার স্বভাবনৈপুণ্য মেয়েদের চিরকেলে সম্পদ। মধুকরিকা সমাহিতিকাকে শুধালো—অথ মালবিকাগতং কৌলীনং কিং শ্রূয়তে?—মালবিকা সম্বন্ধে যে কথা রটেছে তার কিছু শুনেছো? সমাহিতিকা—বাঢ়ং কিল তস্যাং সাভিলাষো ভর্ত্তা। কেবলং দেব্যা ধারিণ্যাশ্চিত্তং রক্ষন্নাত্মনঃ প্রভুত্বং ন দর্শয়তি। মালবিকাপি এষু দিবসেষু অনুভূতমুক্তেব মালতীমালা ম্লান লক্ষ্যতে। অতঃপরং ন জানে। বিসৃজ মাম্‌॥ ৭॥ "মালবিকার উপর প্রভুর বড়োই টান। শুধু পাছে দেবী

ধারিণীর মনে খুব আঘাত লাগে এই ভয়ে মহারাজ কিছু করতে পারছেন না। মালবিকাও গলায়-পরে তারপরে ফেলে-দেওয়া মালতীর মালার মতো ম্লান হয়ে গেছে। আর আমি কিছু জানি নে। আমাকে ছেড়ে দাও।"

ঋতুসংহারম্-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ বর্ণনায় মালতীর দেখা পাওয়া যায় তিনবার :—

কাশৈর্ম্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি।
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্ব্বনান্তাঃ শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ॥ ২॥

কুমুদে শুভ্র সরোবর আজি মরালে শুভ্র নদীজল,
চন্দ্রকিরণে শুক্লা যামিনী, নবকাশফুলে ধরণী,
ছাতিম পুষ্পে শুভ্র বনানী মালতী কুসুমে বনতল,
শরতে আজিকে সেজেছে সবাই মোহন শুভ্রবরণী।

শ্যামলতাঃ কুসুমভারনতপ্রবালাঃ স্ত্রীণাং হরন্তি ধৃতভূষণবাহুকান্তিম্।
দন্তাবভাসবিশদস্মিতচন্দ্রকান্তিং কঙ্কেলিপুষ্পরুচিরা নবমালতী চ॥ ১৮॥

নবকিশলয়-কুসুমের ভারে নুয়ে-পড়া শ্যামলতা
তার কাছে হারে রমণী-বাহুর আভরণ-পরা শোভা,
নব-বিকশিত অশোক কুসুম ফুল্ল মালতী ফুল
হরিতেছে আজ নারীর হাসির কান্তি চিত্তলোভা।

কেশান্নিতান্তঘননীলবিকুঞ্চিতাগ্রানাপূরয়ন্তি বণিতা নবমালতীভিঃ।
কর্ণেষু চ প্রবরকাঞ্চনকুণ্ডলেষু নীলোৎপলানি বিবিধানি নিবেশয়ন্তি॥ ১৯॥

কুঞ্চিত ঘন নীল কুন্তলে সাজায় রমণীদল
নবমালতীর মোহন পুষ্প দিয়া,
চারু কর্ণের পরে যেথা নিতি শোভে হেমকুণ্ডল,
সাজায় সেথায় নীল উৎপল নিয়া।

সাতাশ—তিলক

তিলক বসন্তের ফুল। বসন্ত এলে বনের ললাটে তিলক পরিয়ে দেয়। কুমারসম্ভবম্-এর তৃতীয় সর্গে বসন্তলক্ষ্মীর এই মনোহারিণী বর্ণনা আছে :—

লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনভক্তিচিত্রং মুখে মধুশ্রীস্তিলকং প্রকাশ্য।
রাগেণ বালারুণকোমলেন চূতপ্রবালোষ্ঠমলঞ্চকার॥ ৩০॥

কালো ভ্রমরের কাজল নয়নে এলো বসন্তলক্ষ্মী,
তিলক পুষ্পে অলি-শোভা রচে মুখের পত্ররেখা,
ঊষার রবির আলোকেতে রাঙা আম্রের মঞ্জরী
মনে হোলো যেন অধর রাঙায়ে মধুশ্রী দিলো দেখা।

রাজা দশরথ বসন্তসমাগমে বিলাসিনীদের সঙ্গে বিহার করছেন। রঘুবংশম্-এর নবম্ সর্গে তার বর্ণনা আছে ঃ—

অলিভিরঞ্জনবিন্দুমনোহরৈঃ কুসুমপঙ্ক্তিনিপাতিভিরঙ্কিতঃ।
ন খলু শোভয়তি স্ম বনস্থলীং ন তিলকস্তিলকঃ প্রমদামিব॥ ৪১॥

কাজলবিন্দু সম মনোহর কালো ভ্রমরের দল,
বসে যবে তারা তিলক কুসুম পরে,
মনে হয় তবে বসন্ত-শ্রী-উজল বনস্থল
তিলক-ভূষিতা প্রমদার শোভা ধরে।

তিলক ফুলের শুভ্র সৌন্দর্যের অনুপম বর্ণনা আছে রঘুবংশম্-এর নবম্ সর্গে ঃ—

উপচিতাবয়বা শুচিভিঃ কণৈরলিকদম্বযোগমুপেয়ুষী।
সদৃশকান্তিরলক্ষ্যত মঞ্জরী তিলকজালকজালকমৌক্তিকৈঃ॥ ৪৪॥

শুভ্র পরাগ চিত্রিত চারু তিলক-কলিকা পরে
কাজল-কৃষ্ণ ভ্রমরেরা যবে দলে দলে এসে রাজে,
মনে হয় যেন তিলক কুসুম সেজেছে সোহাগ ভরে
কালো অলকেতে মুক্তার জাল, যে সাজে রমণী সাজে।

নৃপতি অগ্নিমিত্রের সময় কাটানো ভার হয়ে পড়েছে। মন লাগে না কোনো কাজে। সখা বিদূষককে নিয়ে তিনি প্রমোদ-কাননে বেড়াতে গেছেন। বিদূষক রাজাকে বল্লেন, দেখ, ফুলের গহনা পরে বসন্তলক্ষ্মী কি মোহন সাজে সেজেছে! নারীদের প্রসাধন-নৈপুণ্য ম্লান হয়ে যায় এর কাছে।

অগ্নিমিত্র বল্লেন—ঠিক বলেছো, অবাক হয়ে দেখছি বনলক্ষ্মীর শোভা। মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর তৃতীয় সর্গে বনলক্ষ্মীর শোভার বর্ণনা করেছেন কবি ঃ—

রক্তাশোকরুচা বিশেষিতগুণো বিম্বাধরালক্তকঃ
প্রত্যাখ্যাতবিশেষকং কুরবকংশ্যামবদারুণম্।

আক্রান্তা তিলকক্রিয়াপি তিলকৈর্লীনদ্বিরেফাঞ্জনৈঃ
সাবজ্ঞেব মুখপ্রসাধনবিধৌ শ্রীর্মাধবী যোষিতাম্ ॥ ৩০ ॥

রক্ত-অশোক নারী-অধরের লালিমা-গর্ব হরে,
শ্যাম শ্বেত লাল কুরবক দেয় পত্রলেখারে লাজ,
ললাট-তিলকে তিলক ফুলের অলি-শোভা ম্লান করে,
হতমান হোলো সুন্দরীদের প্রসাধন-কলা আজ।

আটাশ—পলাশ, কিংশুক

নব বসন্তের প্রতীক যদি কোনো ফুল থাকে তো সে পলাশ। নীল আকাশের কাছে ধরণী তার বসন্তের বাণী পাঠায় পলাশ ফুল ফুটিয়ে। এই রক্তিম প্রেম-নিবেদনের কি তুলনা আছে? এই ফুলের দুটি নাম—পলাশ ও কিংশুক। দুটি নামই মনোহর। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যিনি এই নামদুটি দিয়েছিলেন তিনি বৈয়াকরণ কিম্বা রাজপ্রতিনিধি ছিলেন না। পলাশের ভাগ্য ভালো। মহাকবির কাছ থেকেও সে সংযত সমাদর লাভ করেছে। কুমারসম্ভবম্-এর তৃতীয় সর্গে আধ-ফোটা পলাশ ফুলের চমৎকার বর্ণনা আছে ঃ—

বালেন্দুবক্রাণ্যবিকাশভাবাদ্বভুঃ পলাশান্যতিলোহিতানি।
সদ্যো বসন্তেন সমাগতানাং নখক্ষতানীব বনস্থলীনাম্ ॥ ২৯ ॥

পলাশ ফুলের রাঙা কুঁড়িগুলি ফোটে নাই ভালো করে,
তাই ধরেছিলো তরুণ চাঁদের মতো বঙ্কিম শোভা,
যেন গো নবীনা-নায়িকার দেহে বসন্ত প্রেমভরে
আঁকিয়া দিয়াছে রক্তিম রেখা অনুপম মনলোভা।

রঘুবংশম্-এর নবম সর্গে বসন্তের বর্ণনা আছে। বসন্ত এলো। মনে হোলো যেন ঋতুরাজ নানা ফুলসম্ভারে রাজা দশরথের সেবা করবার জন্যেই উপস্থিত হয়েছেন ঃ—

উপহিতং শিশিরাপগমশ্রিয়া মুকুলজালমশোভত কিংশুকে।
প্রণয়িণীব নখক্ষতমণ্ডনম্ প্রমদয়া মদযাপিতলজ্জয়া ॥ ৩১ ॥

শীত অবসানে নব বসন্ত সাজাইলো কিংশুকে
রক্তবরণ মুকুলের আভরণে,
যেমতি কামিনী মদ-বিহ্বলা নিবিড় সোহাগ্-সুখে
রক্ত-চিহ্ন আঁকে প্রিয়-দেহে নখ দিয়া রতি-ক্ষণে।

ঋতুসংহারম্-এর ষষ্ঠ সর্গে বসন্ত-বর্ণনায় পলাশ দেখা দিয়েছে তিনবার :—

আদীপ্তবহ্নিসদৃশৈর্ম্মরুতাবধূতৈঃ সর্ব্বত্র কিংশুক-বনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ।
সদ্যো বসন্ত-সময়ে হি সমাচিতেয়ং রক্তাংশুকা নববধূরিব ভাতি ভূমিঃ॥ ১৯॥

বসন্ত বায়ে কেঁপে-কেঁপে ওঠে দীপ্ত বহ্নি সম পুষ্পের ভারে অবনত কিংশুক,
নব বসন্ত এসেছে বলিয়া পরেছে ধরণী যেন নববধূসম রক্তিম অংশুক।

কিং কিংশুকৈঃ শুকমুখচ্ছবিভির্ন ভিন্নং কিং কর্ণিকারকুসুমৈর্ন কৃতং নু দগ্ধম্।
যৎ কোকিলঃ পুনরয়ং মধুরৈর্ব্বচোভির্যূনাং মনঃ সুবদনানিহিতং নিহন্তি॥ ২০॥

শুকের চঞ্চু সম বঙ্কিম কিংশুক ফুলদল যুবতীর হিয়া করে নি কি বিদারণ,
কর্ণিকার কি করেনি দগ্ধ নারীর কোমল হিয়া, কোকিল আবার কেন করে নিপীড়ন!

ঋতুসংহারম্-এর বসন্তবর্ণনার শেষ শ্লোকটির তুলনা নেই। সেই শ্লোকটিতে পলাশ তার যোগ্য মর্যাদা পেয়েছে :—

আম্রী মঞ্জুলমঞ্জরী বরশরঃ সৎ কিংশুকং যদ্ধনু—
র্জ্যা যস্যালিকুলং কলঙ্করহিতশ্ছত্রং সিতাংশুঃ সিতম্।
মত্তেভো মলয়ানিলঃ পরভৃতা যদ্বন্দিনো লোকজিৎ
সোঽয়ং বো বিতরীতরীতু বিতনুর্ভদ্রং বসন্তান্বিতঃ॥ ২৮॥

মঞ্জুল চূতমঞ্জরীদল রচেছে ধনুর শর,
কিংশুক ফুল রচেছে যাহার ধনু,
ধনুকের গুণ রচেছে যাহার অলিকুল মনোহর,
জোছনা রচেছে শ্বেতছত্রের তনু।
মলয় পবন সেবিছে যাহারে মত্ত বারণ সম,
কোকিল যাহার গায় বন্দনা গান,
সাথে লয়ে সখা বসন্তে আজি অনঙ্গ নিরুপম
সবে মঙ্গল করুক নিত্য দান।

ঊনত্রিশ—কুমুদ

কুমুদের ভাগ্য ভালো। বিলাসিনীদের প্রসাধনের উপাদান না হয়েও সে মহাকবির সৌন্দর্য-দৃষ্টির প্রশংসা লাভ করতে পেরেছে। কবির দৃষ্টি হোলো শুদ্ধ দ্রষ্টার দৃষ্টি, ভোক্তার দৃষ্টি নয়। কবির কাছ থেকে কুমুদ সেই দৃষ্টির প্রসাদ লাভ করেছে।

তার গৌরব তার প্রকাশের অনন্যতায়, তার স্বকীয় বিশেষত্বে। কুমুদের এই কদরে উজ্জয়িনীর বিলাসিনীরা হয়তো কবির উপর অভিমান করেছিলেন, কিন্তু তাদের উপেক্ষা করে কালিদাস সৌন্দর্য-লক্ষ্মী ও কাব্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদ নিঃসন্দেহে পেয়েছিলেন।

মেঘদূতম্-এর পূর্বমেঘে যক্ষ মেঘকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে অলকার পথে গম্ভীরা নদীর দেখা পাবে। সেই নদীর চাহনি শুভ্র কুমুদের মতো মনোহারী। সেই চটুল দৃষ্টির অসম্মান যেন না করে মেঘ। তারপরে কৈলাসে যখন পৌঁছবে তখন দেখবে শাদা কুমুদের মত সুন্দর তুষারেতে কৈলাস পর্বতের শিখরগুলি আবৃত। দুটি শ্লোকে এই বর্ণনা দুটি আছে ঃ—

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগা লপ্স্যতে তে প্রবেশম্।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্য্যান্
মোঘীকর্ত্তুং চটুলশফরোদ্বর্ত্তনপ্রেক্ষিতানি॥ ৪০॥

স্বচ্ছ পরাণ সম নির্মল গম্ভীরা নদী-জলে
মিষ্টস্বভাব হে মেঘ তোমার ছায়াখানি পাবে স্থান,
কুমুদ-শুভ্র চটুল দৃষ্টি দিয়ে নদী লীলাছলে
হেরিব তোমায়, সে দিঠির তুমি কোরোনা অসম্মান।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঃ—

গত্বা চোর্দ্ধং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধে
কৈলাসস্য ত্রিদশবণিতাদর্পনস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥ ৫৮॥

রাবণ যাহারে নাড়া দিয়া জোরে দিয়াছিল বিয়াকুলি
অতিথি হইও সুরবালাদের দর্পণ সেই গিরি কৈলাসে তবে,
কুমুদের মতো সাদা তুষারেতে আবৃত শিখরগুলি
যেন শিবের অট্টহাস্য জমিয়া বিরাজিছে নীল নভে।

কুমারসম্ভবম্-এর সপ্তম সর্গে বিবাহ-সভায় গৌরীর সঙ্গে শিবের প্রথম দেখার এই মধুর ছবি আছে ঃ—

তয়া প্রবৃদ্ধাননচন্দ্রকান্ত্যা প্রফুল্লচক্ষুকুমুদঃ কুমার্য্যা।
প্রসন্নচেতঃসলিলঃ শিবোঽভুৎ সংসৃজ্যমানঃ শরদেব লোকঃ॥ ৭৪॥

প্রফুল্লমুখী চন্দ্রকান্তি গৌরীর সাথে যবে
সাক্ষাৎ হোলো মহেশ্বরের বিবাহসভার মাঝে,
বিকশিত হোলো শিবের নয়ন শরৎ-কুমুদ সম,
শরতের নদী সম প্রাণ তাঁর সাজে আনন্দ-সাজে।

শিব পার্বতীকে চারদিকের দৃশ্য দেখিয়ে বলছেন ঃ—
এতদুচ্ছ্বসিতপীতমৈন্দবংসোঢ়ুক্ষমমিব প্রভারসম্।
মুক্তষট্পদবিরাবমঞ্জসা ভিদ্যতে কুমুদমা নিবন্ধনাৎ॥ ৭০॥

এই কুমুদেরা চাঁদের কিরণ আকণ্ঠ করি পান
বে-সামাল হয়ে বৃন্ত অবধি ফুটিয়া উঠেছে তারা,
যে ভ্রমর ছিলো কুমুদ-কোরকে আবদ্ধ, হতমান,
মুক্তি লভিয়া করে গুঞ্জন আনন্দে দিশাহারা।

রাজকুমারী ইন্দুমতী স্বয়ংবৃতা। অজকে পতিরূপে বরণ করবার পর স্বয়ংবর সভায় আগত নৃপতিদের কি রকম অবস্থা হোলো তার বর্ণনা রঘুবংশম্-এর ষষ্ঠ সর্গে আছে ঃ—

প্রমুদিতবরপক্ষমেকতস্তৎ ক্ষিতিপতিমণ্ডলমন্যতো বিতানম্।
উষসি সর ইব প্রফুল্ল-পদ্মং কুমুদবনপ্রতিপন্ননিদ্রমাসীৎ॥ ৮৬॥

প্রফুল্ল বরপক্ষীয় দল সভার একটি ধারে,
অন্য দিকেতে নীরস-বদন নৃপতিরা দলে দলে,
যেন প্রভাতের সায়র, পদ্ম বিকশিত এক দিকে,
ও ধারে কুমুদ সুপ্তিমগন শোভে সায়রের জলে।

নৃপতি কুশ মারা গেলেন। দুর্জয় দৈত্যকে বধ করলেন বটে কিন্তু নিজেও নিহত হলেন। তাঁর মহিষী কুমুদ্বতী তাঁর অনুগমন করলেন। রঘুবংশম্-এর সপ্তদশ সর্গে তার বর্ণনা করে কবি বল্ছেন ঃ—

তং স্বসা নাগরাজস্য কুমুদস্য কুমুদ্বতী।
অন্বগাৎ কুমুদানন্দং শশাঙ্কমিব কৌমুদী॥ ৬॥

কুমুদ ফুলেরে আনন্দ দেয় যে শশাঙ্ক নভে,
তার পিছু পিছু জোৎস্নার যথা গতি,
মহাযশস্বী কুশের সহিত করিল গমন তবে
নাগরাজস্বসা মহিষী কুমুদ্বতী।

কুশের পুত্র নৃপতি অতিথি অতুলগুণসম্পন্ন। তাঁর গুণের বর্ণনা রঘুবংশম-এর সপ্তদশ সর্গে আছে :—

ইন্দোরগতয় পদ্মে সূর্যস্য কুমুদেঽংশবঃ।
গুণাস্তস্য বিপক্ষেঽপি গুণিনো লেভিরেঽন্তরম্॥ ৭৫॥

চন্দ্রিমা-আলো পশে না কভুও পদ্মের অন্তরে,
সূর্যকিরণ নাহি লভে স্থান কুমুদ ফুলের প্রাণে,
নৃপ অতিথির এমনি আছিল অতুলন গুণরাশি
শত্রুও তাঁর হোতো আকৃষ্ট গুণগরিমার টানে।

রঘুবংশম্-এর একোনবিংশ সর্গে কাম-বিলাসী নৃপতি অগ্নিবর্ণের বিলাস-লীলার ছবি এঁকেছেন কবি কালিদাস :—

যোষিতামুড়ুপতেরিবার্চিষাং স্পর্শনির্বৃতিমসাববাপ্নুবন্।
আরুরোহ কুমুদাকরোপমাং রাত্রিজাগরপরো দিবাশয়ঃ॥ ৩৪॥

কুমুদ-ফুল্ল সায়র যেমন চাঁদের পরশ তরে
সারা রাত জাগি ঘুমায় সকাল হলে,
তেমনি নৃপতি অগ্নিবর্ণ কামিনী-পরশ যাচি
সারা রাত জাগি কাটাতেন দিন সুপ্তি-শয়ানতলে।

প্রিয়ার পরশে দেহে তেমনি আনন্দ-শিহরণ জাগে যেমন শিহরণ জাগে কুমুদের দেহে চাঁদের আলোর ছোঁয়ায়। বিক্রমোর্বশীয়ম্-এর তৃতীয় অঙ্কে এই মনোহারিণী বর্ণনা আছে :—

অন্যৎ কথমিব পুলকৈঃ কলিতং মম গাত্রকং করস্পর্শাৎ।
নোচ্ছ্বসিতি তপনকিরণৈশ্চন্দ্রস্যেবাংশুভিঃ কুমুদম্॥ ১২০॥

পরশমাত্র যবে শিহরিয়া ওঠে দেহ অনুখন,
বুঝিতে কি কভু বাধে গো তখন প্রিয়া সে ছুঁয়েছে মোরে,
চাঁদের আলোতে কুমুদের দেহে জাগে ঘন শিহরণ,
কুমুদের হিয়া কভু কি কাঁপায় রবির কিরণ ভোরে!

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে আমরা কুমুদের দেখা পাই। তৃতীয় অঙ্কে রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে সম্বোধন করে বল্ছেন ঃ—

তপতি তনুগাত্রি মদনস্ত্বামনিশং মাং পুনর্দহত্যেব।
গ্লপয়তি যথা শশাঙ্কং ন তথাপি কুমুদ্বতীং দিবসঃ॥ ৪৫॥

অয়ি কৃশাঙ্গি! মদন তোমারে দহিছে এ কথা মানি,
মোরে অনঙ্গ অঙ্গার করি পুড়াইছে নিশি দিন,
যত ক্লেশ দেয় দিন চন্দ্রেরে সূর্যের কর হানি,
কুমুদ কভুও এতো ব্যথা নাহি পায় যবে আসে দিন।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর চতুর্থ অঙ্কে কণ্বের একজন শিষ্য বল্ছেন ঃ—

অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী মে দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শোভা
ইষ্টপ্রবাসজনিতান্যবলাজনস্য দুঃখানি নূনমতিমাত্রসুদুঃসহানি॥ ৩০॥

চাঁদ ডুবে গেলে কুমুদ ফুলের শোভা
ম্লান হয়ে শেষে বিরাজে স্মৃতির মাঝে,
প্রবাসে যাহার প্রিয়তম গেছে সেই নারী বিরহিনী
তার বুকে দুখ অসহ ব্যথায় বাজে।

শকুন্তলাকে নিয়ে কণ্বের দুটি শিষ্য ও বৃদ্ধা গৌতমী দুষ্মন্তের রাজসভায় গেছেন। শকুন্তলাকে তিনি বিবাহ করেছেন এ কথা স্মরণ করতে পারছেন না দুষ্মন্ত দুর্বাসার অভিশাপে। তপস্বীরা বার বার চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন। পঞ্চম অঙ্কে দুষ্মন্ত বল্ছেন তপস্বীকে ঃ—

কুমুদান্যেব শশাঙ্কঃ সবিতা বোধয়তি পঙ্কজান্যেব।
বশিনাং হি পরপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্মুখী বৃত্তিঃ॥ ১০০॥

কেবল কুমুদে বিকশিয়া তোলে চন্দ্র,
রবি করে শুধু কমলেরে বিকশিত,
জিতেন্দ্রিয় পুরুষ-চিত্তে কাম নাহি পায় রন্ধ্র,
নহে পরনারী-পরশনে কলুষিত।

ঋতুসংহারম্-এর শরৎ-বর্ণনায় কুমুদ ছ'বার দেখা দিয়েছে ঃ—

কাশৈর্ম্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো হংসৈর্জ্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি।
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্ব্বনান্তাঃ শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ॥ ২॥

কুমুদে শুভ্র সরোবর আজি মরালে শুভ্র নদীজল,
চন্দ্রকিরণে শুক্লা যামিনী, নবকাশফুলে ধরণী,
ছাতিম পুষ্পে শুভ্র বনানী, মালতী কুসুমে বনতল,
শরতে আজিকে সেজেছে সবাই মোহন শুভ্রবরণী।

কহ্লারপদ্মকুমুদানি মুহুর্ব্বিধুন্বংস্তৎসঙ্গমাদধিকশীতলতামুপেতঃ।
উৎকণ্ঠয়ত্যতিতরাং পবনঃ প্রভাতে পত্রান্তলগ্নতুহিনাম্বুবিধূয়মানঃ॥ ১৫॥

সরোবরনীরে পদ্মকুমুদকহ্লারে কাঁপাইয়া, তাদের পরশি সুশীতল সমীরণ,
অতি সযতনে পত্রলগ্ন শিশির বহিয়া আনি, করিছে ব্যাকুল আজ সবাকার মন।

স্ফুটকুমুদচিতানাং রাজহংসাশ্রিতানাং মরকতমণিভাসা বারিণা ভূষিতানাম্।
শ্রিয়মতিশয়রূপাং ব্যোম তোয়াশয়ানাং বহতি বিগতমেঘং চন্দ্রতারাবকীর্ণম্॥ ২১॥

মরকতমণি সম নির্মল স্বচ্ছ সায়রজলে কলহংস ও কুমুদ নয়নলোভা,
মেঘ-বিমুক্ত নীল অম্বর শশিতারকায় ভরা অনুরাগ ভরে ধরিছে সায়র-শোভা।

শরদি কুমুদসঙ্গাদ্বায়বো বান্তি শীতা বিগতজলদবৃন্দা দিগ্বিভাগা মনোজ্ঞাঃ
বিগতকলুষমম্ভঃ শ্যানপঙ্কা ধরিত্রী বিমলকিরণচন্দ্রং ব্যোম তারাবিচিত্রম্॥ ২২॥

শীতল সমীর কুমুদসঙ্গলাভে, মেঘহীন নভ, চারিদিক মনোহর,
নির্মল নীল শরতের ধারা, কর্দমহারা ধরা, চন্দ্রকিরণে তারকাশোভায় সুশোভিত অম্বর।

দিবসকরময়ূখৈর্বোধ্যমান প্রভাতে বর-যুবতি-মুখাভং পঙ্কজং জৃম্ভতেঽদ্য।
কুমুদমপি গতেঽস্তং লীয়তে চন্দ্রবিম্বে হসিতমিব বধূনাং প্রোষিতেষু প্রিয়েষু॥ ২৩॥
প্রভাতসূর্যকিরণস্ফুট সুন্দর শতদল সুন্দরী-নারী-আননের শোভা ধরে,
বিরহবিধুরা রমণীর হাসি সম কুমুদের শোভা চন্দ্র অস্ত গেলে ক্ষীণ হয়ে মরে।

বিকচকমলবক্ত্রা ফুল্লনীলোৎপলাক্ষী বিকসিতনবকাশশ্বেতবাসো বসনা।
কুমুদরুচিরকান্তিঃ কামিনীবোন্মদেয়ং প্রতিদিশতু শরদ্বশ্চেতসঃ প্রীতিমগ্র্যাম্॥
॥ ২৬ ॥

নবীন কাশের শ্বেত অংশুকে সোহাগে দেহটি ঘিরে,
উৎপল-আঁখি বিকচ-পদ্ম-আননা,
মদ-উন্মনা রমণীর প্রায় প্রীতিতে ভরুক চিত্ত,
শারদলক্ষ্মী শুভ্র-কুমুদ-বরণা।

ত্রিংশ—শ্যামালতা

শ্যামালতার কথা কালিদাসের রচনায় ছড়ানো থাকলেও শ্যামালতার ফুলের কথা ঋতুসংহারম্-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ বর্ণনায় বারেকের তরে পাই ঃ—

শ্যামালতা কুসুমভারনতপ্রবালাঃ স্ত্রীণাং হরন্তি ধৃতভূষণবাহুকান্তিম্।
দন্তাবভাসবিশদস্মিতচন্দ্রকান্তিং কঙ্কেলিপুষ্পরুচিরা নবমালতী চ॥ ১৮॥

নব কিশলয় কুসুমের ভারে নুয়ে-পড়া শ্যামলতা
তার কাছে হারে রমণীবাহুর আভরণ-পরা শোভা,
অশোক কুসুম নব বিকশিত ফুল্ল মালতী ফুল
হরিতেছে আজ নারীর হাসির কান্তি চিত্তলোভা।

একত্রিংশ—সপ্তচ্ছদ ফুল

সাতটি পাতা একটি বৃন্তে বলে এই গাছটির নাম হয়েছে সপ্তচ্ছদ কিম্বা সপ্তপর্ণ। এ আমাদের চির-পরিচিত ছাতিম গাছ। শরতে ছাতিম ফুল ফোটে, শুভ্র তার বরণ, গন্ধটি তীব্র। ঋতুসংহারম্-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ-বর্ণনায় ছাতিম ফুলের দেখা পাই ঃ—

কাশৈর্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি।
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্বনান্তাঃ শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ॥ ২॥

কুমুদে শুভ্র সরোবর আজি মরালে শুভ্র নদীজল,
চন্দ্রকিরণে শুক্লা যামিনী নবকাশ ফুলে ধরণী,
ছাতিম পুষ্পে শুভ্র বনানী মালতী কুসুমে বনতল,
শরতে আজিকে সেজেছে সবাই মোহন শুভ্রবরণী।

বত্রিশ—বেতস-মঞ্জরী

ভেবে পাই না কি করে বেতস তরুর মঞ্জরী মহাকবির মন পেলো! বেতের ব্যবহার রাজসভায় নিশ্চয়ই ছিলো, কিন্তু বেতস মঞ্জরীর ব্যবহার তো রাজ-অন্তঃপুরে ছিলো বলে জানি নে। বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্-এর চতুর্থ অংকে উর্বশী-বিরহকাতর রাজা বনে-উপবনে প্রিয়ার সন্ধান করে ফিরছেন। বর্ষায় প্রকৃতি নানা ফুলের সম্ভারে সেজেছে। তাই দেখে রাজা বলছেন—যৎ প্রাবৃষেণ্যোরেব চিহ্নৈঃ সম্প্রতি মহারাজোপচারঃ ক্রিয়তে॥ ২৯॥ —বর্ষাকালের নানা বস্তু আমার রাজোচিত সাজসরঞ্জাম, উপকরণ রচনা করেছে। যেমন ঃ—

বিদ্যুল্লেখা-কনকরুচিরশ্রীর্বিতানং মমাভ্রো
ব্যাধূয়ন্তে নিচুলতরুভির্মঞ্জরীচামরাণি।
ঘর্মচ্ছেদাৎ পটুতরগিরো বন্দিনো নীলকণ্ঠা,
ধারাসারোপনয়নপরা নৈগমাশ্চাম্বুবাহাঃ॥ ৩০॥

তড়িৎ-কনকসূতায় গ্রথিত মেঘের চন্দ্রাতপ,
রচিছে চামর নিচুল তরুর মঞ্জরী অনুপম,
গ্রীষ্মের শেষে ময়ূরময়ূরী করে বন্দনারব,
মেঘদল আনে ধারা-সম্ভার নিপুণ বণিক সম।

তেত্রিশ—অতিমুক্তলতা

এই লতাটির তারিফ করেছেন কবি, তবে খুব বেশী নয়। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর তৃতীয় অংকে প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে বলছেন ঃ—সখি! দিষ্ট্যা অনুরূপঃ তে অভিনিবেশঃ। সাগরং বর্জ্জয়িত্বা কুত্র বা মহানদী অবতরতি। কঃ ইদানীং সহকারম্ অন্তরেণ অতিমুক্তলতাং পল্লবিতাং সহতে॥ ২৪॥

"সখি, তোমার অনুরাগ তোমার যোগ্য হয়েছে। সাগর ছেড়ে মহানদী আর কোথায় গিয়ে নামে? সহকার তরু ছাড়া পল্লবিতা অতিমুক্তলতার ভার কে সইতে পারে?"

বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্-এর দ্বিতীয় অংকে উপবনে বেড়াতে বেড়াতে বিদূষক রাজাকে বলছেন ঃ—এষ কৃষ্ণমণিশিলাপট্টসনাথঃ অতিমুক্তলতামণ্ডপো ভ্রমরসংঘবিঘট্টিতৈঃ কুসুমৈঃ কৃতোপচার ইবাত্র ভবতো বর্ত্ততে। তদনুগৃহ্যতামেষঃ॥ ৫০॥

এই অতিমুক্তলতামণ্ডপে একটি কালো শিলা পাতা। ভ্রমরের তাড়নায় লতা থেকে ফুল ঝরে পড়ে যেন অভ্যর্থনা করছে। এর অভ্যর্থনা দয়া করে গ্রহণ করো।

চৌত্রিশ—মাধবী

মাধবী বিতানের কথা কালিদাসের রচনায় বহু জায়গায় আছে। মাধবী ফুলের কথা এই একটি জায়গাতেই পাচ্ছি। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর ষষ্ঠ অংকে বিদূষক রাজাকে বল্‌ছেন ঃ—এষঃ মণিশিলাপট্টকসনাথঃ মাধবীমণ্ডপঃ উপহার রমণীয়তয়া নিঃসংশয়ং স্বাগতেন ইব নৌ প্রতীচ্ছতি। তৎ প্রবিশ্য নিষীদতু ভবান॥ ৪৫॥

এই মাধবীমণ্ডপে মণিময় শিলার আসন বিছানো। মনে হচ্ছে মাধবীলতা আমাদের ফুল-উপহার দিয়ে স্বাগত করছে। কুঞ্জে প্রবেশ করে উপবেশন করো।

পঁয়ত্রিশ—শিরীষ

গ্রীষ্মের ফুল শিরীষ। রৌদ্র-দগ্ধ ধরণীর ব্যথার রক্তিম রূপ নিয়ে সে আসে আমাদের কাছে। পর্যাপ্ত না হলেও কিছু সমাদর সে পেয়েছে কালিদাসের কাছে। কুমারসম্ভবম্-এর প্রথম সর্গে পার্বতীর বাহু দুটির অনুপম সৌন্দর্য বর্ণনা করে কবি বল্‌ছেন ঃ—

শিরীষপুষ্পাধিকসৌকমার্য্যৌ বাহূ তদীয়াবিতি মে বিতর্কঃ।
পরাজিতেনাপি কৃতৌ হরস্য যৌ কণ্ঠপাশৌ মকরধ্বজেন॥ ৪১॥

যত সুকুমার শিরীষ কুসুম তার চেয়ে সুকুমার
গৌরীর বাহুদুটি ছিলো হৃদয়হরণ অতি,
বাহুদুটি দিয়ে তাই রচেছিল শিবের কণ্ঠপাশ
শিবের সমীপে যবে পরাভব মেনেছিল রতিপতি।

কুমারসম্ভবম্-এর পঞ্চম সর্গে পার্বতী-জননী পার্বতীকে তপস্যা করতে বারণ করে বল্‌ছেন ঃ—

মনীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবতাস্তপঃ ক্ব চ তাবকং বপুঃ।
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ॥ ৪॥

মোদের ভবনে বিরাজেন সদা বাঞ্ছিত দেবগণ,
কেন তপস্যা? শোভা পায় কি তা তব দেহে সুকুমার?
কোমল শিরীষ কুসুম সে সহে অলিপদপরশন,
তাই বলে কি গো সহিতে সে পারে বিহগের পদভার!

মেঘদূতম্-এর উত্তর মেঘ খণ্ডে অলকার সুন্দরীদের বর্ণনায় আছে ঃ—

হস্তে লীলা কমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম্
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নব কুরবকং চারুকর্ণে শিরীষম্
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥ ২॥

বধূদের হাতে লীলার কমল, কুন্দ কুসুম অলকে,
পাণ্ডু আননে আনিয়াছে শ্রী লোধ্র-রসের ঝলকে।
বেণীতে তাদের নব কুরবক কর্ণে শিরীষ অতুল,
সীঁথিতে তাদের বর্ষার দূতী নব কদম্ব দোদুল।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর প্রথম অঙ্কে নটী গাইছেন ঃ—

ঈষদীষচ্চুম্বিতানি ভ্রমরৈঃ সুকুমারকেশরশিখানি।
অবতংসয়ন্তি দয়মানাঃ প্রমদাঃ শিরীষকুসুমানি॥ ৯॥

শিরীষ ফুলের কোমল কেশরগুলি
অতি ধীরে ধীরে করে অলি চুম্বন,
অতি সযতনে বিলাসিনীদল শিরীষ কুসুম তুলি
রচে তাহা দিয়া কর্ণের আভরণ।

সেই প্রথম অঙ্কেই শকুন্তলার পরিশ্রান্ত অবস্থা দেখে দুষ্মন্ত প্রিয়ম্বদাকে বল্ছেন ঃ—

স্রস্তাংসাবতিমাত্রলোহিততলৌ বাহূ ঘটোৎক্ষেপনাদ্ অদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসঃ প্রমাণাধিকঃ।
স্রস্তং কর্ণশিরীষরোধি বদনেঘর্ম্মাভসাং জালকং বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তযমিতা পর্য্যাকুলা মূর্দ্ধজাঃ॥ ১২০॥

ঘট তুলে তুলে বাহুদুটি পরিশ্রান্ত, করতল দুটি রাঙা ঘটঘর্ষণে,
ঘন নিঃশ্বাসে কাঁপে স্তনদুটি কানের শিরীষ কপোলে ঘর্মসিক্ত,
আনন সিক্ত ঘর্মধারায়, কবরী বাঁধন খুলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে,
একটি হাতেতে ধরে আছে বালা কেশরাশি এলায়িত।

রঘুবংশম্-এর ষোড়শ সর্গে শিরীষ ফুলের উপর মনোহর দুটি শ্লোক আছে। প্রথমটি ঃ—

স্বেদানুবিদ্ধার্দ্রনখক্ষতাঙ্কে ভূয়িষ্ঠসন্দষ্টশিখং কপোলে।
চ্যুতং ন কর্ণাদপি কামিনীনাং শিরীষপুষ্পং সহসা পপাত॥ ৪৮॥

কামিনীগণের কর্ণ হইতে শিরীষের আভরণ
স্খলিত হলেও খসিয়া কুসুম পড়িলনা ভূমিতলে,

কপোল তাদের ঘর্মসিক্ত নখ-ক্ষত-লাঞ্ছিত,
কপোলের ক্ষতে শিরীষের শিখা রয়ে গেলো কত ছলে!

দ্বিতীয়টি ঃ—

অমী শিরীষপ্রসবাবতংসাঃ প্রভ্রংশিনো বারিবিহারিণীনাম্।
পরিপ্লবাঃ স্রোতসি নিম্নগায়াঃ শৈবাল লোলাংশ্চলয়ন্তি মীনান্॥ ৬১॥

জলবিহারিণী সুন্দরীদের কানের শিরীষ ফুল,
হের ভাসিতেছে নদীর স্রোতেতে, কি শোভা চমৎকার,
ঢেউ-চঞ্চল শিরীষ কুসুমে শৈবাল ভ্রম করি
শৈবাল-প্রিয় মাছগুলি পড়ে ছলনায় বার বার।

ছত্রিশ—পাটল

পাটল নামটি মন্দ নয় কিন্তু আমাদের প্রাকৃত ভাষার পারুল নামটি আরো শ্রুতি-মধুর। নিদাঘের ফুল পাটল। ফুলগুলির নিজস্ব গৌরব কিম্বা মাধুর্য যেন কিছুই ছিলো না মহাকবির কাছে, কিম্বা থাকলেও খুবই কম ছিলো। বিলাসিনীদের আভরণ আর কামীজনের চিত্তবিনোদন এই দুই কাজের বরাত নিয়েই যেন তারা বনে উপবনে ফুটে উঠেছিলো! ব্যবহারে লাগে বলেই কি ফুলের আদর? ফুল কি তার বিনা প্রয়োজনের সৌন্দর্যে আমাদের ভালোবাসা দাবী করতে পারে না? পাটল ফুলের কথা কালিদাসের রচনায় খুবই কম। অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্-এর প্রথম অঙ্কে সূত্রধার বল্ছেন ঃ—

সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ।
প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণাম রমণীয়াঃ॥ ৮॥

সুখকর এবে সলিলে গাহন পাটল ফুলের গন্ধ-মাখানো বায়ু,
তরুতলে ঘুম আসে সহজেই, মধু হয় দিন যতো শেষ হয় আয়ু।

রঘুবংশম্-এর ষোড়শ সর্গে দেখি ইক্ষু-রসের পুরানো মদিরার সঙ্গে আম গাছের কিশলয় আর নব প্রস্ফুট পাটল ফুল বিলাসীদের চিত্তবিনোদনে লেগে গেছে ঃ—

মনোজ্ঞগন্ধং সহকারভঙ্গং পুরাণশীধুং নবপাটলং চ।
সংবধ্নতা কামিজনেষু দোষাঃ সর্ব্বে নিদাঘাবধিনা প্রমৃষ্টাঃ॥ ৫২॥

আম্রের নবপল্লব আর নূতন পাটল ফুল,
তারি সাথে হয় ইক্ষুরসের পুরাণ আসব ঢালা,
অতি সুবাসিত এই তিন দিয়ে মুগ্ধ নিদাঘ কাল,
নিদাঘ-তাপিত কামিজনদের ঘুচালো সকল জ্বালা।

রঘুবংশম্-এর একোনবিংশ সর্গে নৃপতি অগ্নিবর্ণের বিলাস-লীলার এই বর্ণনা আছে ঃ—

যৎ স লগ্নসহকারমাসবং রক্তপাটলসমাগমং পপৌ।
তেন তস্য মধুনির্গমাৎ কৃশশ্চিত্তযোনিরভবৎ পুনর্নব॥ ৪৬॥

রক্ত-পাটল-ফুল-রঞ্জিত নবকিশলয়-মেশানো
মনোহর সুরা করিতেন পান নৃপতি অগ্নিবর্ণ,
মধু মাস গেলে মনের আগুন হয়ে যেতো যবে নেবানো,
সুরাপান করি সেই আগুনেরে করিতেন নব বর্ণ।

ঋতুসংহারম্-এর প্রথম সর্গের শেষ শ্লোকটিতে নিদাঘে যা যা সুখ-দায়ক তার মধ্যে পাটল স্থান পেয়েছে। ব্যবহারে যা না লাগে তার প্রতি যেন মহাকবির নজর নেই। এমন ব্যবহারিক-বস্তুতান্ত্রিকতা এ যুগেও দুর্লভ!

কমলবনচিতাম্বুঃ পাটলামোদরম্যঃ সুখসলিলনিষেকঃ সেব্যচন্দ্রাংশুহারঃ।
ব্রজতু তব নিদাঘঃ কামিনীভিঃ সমেতো নিশি সুললিতগীতে হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে সুখেন॥ ২৮॥

ভালো লাগে হিম-সলিলে সিনান, মধুর জোছনা যে কালে,
ফোটে শতদল, পাটল ফুলের গন্ধ লুটায় কাননে,
জোৎস্নাপ্লাবিতা নিদাঘ-যামিনী সুললিত গীতগানে
নারীদের সাথে মহা-আনন্দে কাটুক কুসুমশয়নে।

সাঁইত্রিশ—নবমল্লিকা

মধুমাসের ফুল নবমল্লিকা। এর আর একটি মিষ্টি নাম আছে—সপ্তলা। রঘুবংশম্-এর নবম্ সর্গে নবমল্লিকার সৌন্দর্যের এই সুন্দর বর্ণনা আছে ঃ—

অমদয়ন্ মধুগন্ধসনাথয়া কিসলয়াধরসংগতয়া মনঃ।
কুসুমসম্ভৃতয়া নবমল্লিকা স্মিতরুচা তরু চারু বিলাসিনী॥ ৪২॥

চারুবিলাসিনী নবমল্লিকা গন্ধবাসিত নব-কিশলয়-অধরে
বিকচ ফুলের শুভ্র হাস্যে আশ্রয়-তরু-চিত্ত হরিয়া বিহরে।

রঘুবংশম্-এর ষোড়শ সর্গে এই মধুর শ্লোকটি দিয়ে নবমল্লিকার বর্ণনা করেছেন কবি ঃ—

বনেষু সায়ন্তনমল্লিকানাং বিজৃম্ভণোদ্গন্ধিষু কুটমলেষু।
প্রত্যেকনিক্ষিপ্তপদঃ সশব্দং সংখ্যামিবৈষাং ভ্রমরশ্চকার॥ ৪৭॥

ফুটিয়া উঠিল বনেতে সান্ধ্যমল্লিকামঞ্জরী,
চারিদিক তারা ভরিয়া তুলিল অনুপম সৌরভে,
যাওয়া-আসা করে কোরকে কোরকে মুগ্ধ ভ্রমর-ভ্রমরী,
মনে হয় তারা কুঁড়ি গুণে গুণে ফেরে গুঞ্জন রবে।

এই ষোড়শ সর্গেই আর একটি শ্লোকে নবমল্লিকার দেখা পাই ঃ—

স্নানার্দ্রমুক্তেষ্বনুধূপবাসং বিন্যস্তসায়ন্তনমল্লিকেষু ।
কামো বসন্তাত্যয়মন্দবীর্য্যঃ কেশেষু লেভে বলমঙ্গনানাম্ ॥ ৫০॥

মধুমাস গেলে দুর্বল ম্লান হইল মদন তবে
এবে নিদাঘ-তাপিত সিনান-সিক্ত এলায়িত-কুন্তল,
কেশেতে সাঁঝের নবমল্লিকা পরে রমণীরা যবে
ধূপ-সুবাসিত কেশ-শোভা হেরি মদন লভিল বল ।

ঋতুসংহারম্-এর ষষ্ঠ সর্গে বসন্তের বর্ণনায় এই শ্লোকটি আছে ঃ—

কর্ণেষু যোগ্যং নবকর্ণিকারং চলেষু নীলেষ্বলকেষ্বশোকম্ ।
পুষ্পঞ্চ ফুল্লং নবমল্লিকায়াঃ প্রয়াতি কান্তিং প্রমদাজনস্য ॥ ৫ ॥

নারীর কর্ণভূষণযোগ্য কুসুম কর্ণিকার ঘনকালো কেশে ভূষণ অশোক ফুল,
নমর্মল্লিকা তরুটি ভরিয়া ফোটে যে মোহন ফুল, রূপে ভরে তারা নারীর দেহের কূল ।

আটত্রিশ—নবমালিকা

জানি না নবমালিকা নবর্মল্লিকার নাম কি না। মনে হয় তা নয়। প্রাকৃতে এই লতিকার নাম নোমালি। রক্তবর্ণ ফুল শরতে ফোটে। নবমালিকা নামে যে একটি লতা ছিলো তার প্রমাণ পাই অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এর চতুর্থ অঙ্কে। প্রাকৃতে নয়, সংস্কৃত ভাষায় মহাকবি বলাচ্ছেন কাশ্যপের মুখ দিয়ে ঃ—সংকল্পিতং প্রথমমেব ময়া তবার্থে ভর্ত্তারমাত্মসদৃশংসুকৃতৈর্গতা ত্বম্ । চূতেন সংশ্রিতবতী নবমালিকেয়ম্ অস্যামহং ত্বয়ি চ সম্প্রতি বীত-চিন্তঃ॥ ১৭॥

তোমার জন্যে আমি প্রথম থেকেই যে রকম ভেবেছিলুম, নিজের সুকৃতির জোরে তুমি সেইরূপ পতি লাভ করেছো। এই নবমালিকা লতা সহকার তরুকে আশ্রয় করেছে। এই লতা এবং তুমি তোমাদের দুজনের সম্বন্ধেই নিশ্চিন্ত হলাম।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে নবমালিকা লতাটি নবমল্লিকা থেকে আলাদা। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এর প্রথম অঙ্কে তিনবার নবমালিকার উল্লেখ পাই। অনসূয়া বল্‌ছেন শকুন্তলাকে ঃ—হলা শকুন্তলে! ত্বত্তঃ অপি তাতকাশ্যপস্য ইমে আশ্রয়বৃক্ষকাঃ প্রিয়তরা ইতি তর্কয়ামি, যেন নবমালিকাকুসুমপেলবা অপি ত্বম এতেষাম্ আলবাল-পূরণে নিযুক্তা॥ ৪৬॥

সখি, মনে হয় তুমি যতো প্রিয় তাত কাশ্যপের তার চেয়ে প্রিয় এই আশ্রম-তরুগুলি। তা না হলে নবমালিকার মতো কোমল তোমাকে গাছে জল দেওয়ার কাজে লাগাতেন না তিনি।

প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে বল্‌ছেন ঃ—হলা শকুন্তলে! ইয়ং স্বয়ংবর বধূঃ সহকারস্য ত্বয়া কৃতনামধেয়া বনজ্যোৎস্না ইতি নবমালিকা। এণাং বিস্মৃতা অসি॥ ৫৪॥

সখি, এই নবমালিকার নাম দিয়েছিলে তুমি বনজ্যোৎস্না। দেখ, সে কেমন স্বয়ংবরা হয়ে সহকার তরুকে আশ্রয় করেছে। তাকে কি তুমি ভুলে গেছো?

আকুলতার সঙ্গে শকুন্তলা বলছেন সখিদের ঃ—অম্মো! সলিলসেকসংভ্রমোদ্গত নবমালিকামুজ্ঝিত্বা বদনং মে মধুকরোঽভিবর্ত্ততে॥ ৬৪॥

দেখ, নবমালিকায় জল ঢালায় একটি ভ্রমর তার থেকে উড়ে আমার মুখের দিকে আসছে।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এর পঞ্চম অঙ্ক। দুষ্মন্তের রাজসভায় শকুন্তলা এসেছেন। দুষ্মন্ত তাঁকে চিনতেই পারলেন না। তখন শকুন্তলা নানা ঘটনার উল্লেখ করে তপোবনে তাঁদের মিলনের দিনগুলি দুষ্মন্তকে মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন। বলছেন ঃ—ননু একস্মিন্ দিবসে নলিনীপত্রভাজনগতম্ তব হস্তে সন্নিহিতম্ আসীৎ॥ ৭৮॥

মনে আছে একদিন নবমালিকামণ্ডপে পদ্মপাতায় তৈরী পাত্রে জল নিয়ে তুমি তুলে ধরেছিলে সেই পাত্র?

ঊনচল্লিশ—অর্জুনমঞ্জরী

নিদাঘেতে ফোটে অর্জুনমঞ্জরী। রঘুবংশম্-এর ষোড়শ সর্গে নিদাঘকালে প্রস্ফুটিত অর্জুনমঞ্জরীর মনোহর ছবি এঁকেছেন কালিদাস ঃ—

আপিঞ্জরা বদ্ধরজকণত্বাৎ মঞ্জর্যুদারা শশুভেঽর্জ্জুনস্য
দগ্ধাপি দেহং গিরিশেন রোষাৎ খণ্ডীকৃতা জ্যেব মনোভবস্য॥ ৫১॥

অর্জুনফুল মঞ্জরীগুলি চূর্ণ পরাগ মেখে
পিঞ্জর রঙে করিল ধারণ অপরূপ রূপ, মরি,
ধূর্জটি-রোষে ভস্ম মদন, চূর্ণ ধনুর্গুণ,
মনে হোলো রাজে সে ধনুকগুণ কুসুমের রূপ ধরি।

চল্লিশ—চূতমঞ্জরী

বসন্তের চূতমঞ্জরী কালিদাসের রচনায় বার বার দেখা দিয়েছে। ফলের আশাতেই কি ফুলের তারিফ করেছিলেন কবি? কে জানে!

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এর পঞ্চম অঙ্কে অন্তরীক্ষে গীত এই গানটির উল্লেখ আছে ঃ—

অভিনবমধুলোলুপস্ত্বং
তথা পরিচুম্ব্য চূত-মঞ্জরীম্।
কমলবসতিমাত্রনির্বৃতঃ
মধুকর! বিস্মৃতঃ অসি এনাং কথম্?॥ ৩॥

অভিনবমধুলোভে হে ভ্রমর পরম সোহাগভরে
করেছিলে কতো চুম্বন তুমি আম্রমুকুলদলে,
এবে মধুপানে তৃপ্ত হইয়া ভুলিলে কেমন করে
সেদিনের সেই প্রেমলীলা তব, তার স্মৃতি-পরিমলে!

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এর ষষ্ঠ অংকে প্রথমা উদ্যানপালিকা বল্ছে ঃ—আতাম্র হরিত পাণ্ডুর বসন্তমাসস্য জীবনসর্ব্বস্ব্য! দৃষ্টঃ অসি চূতকোরক! ঋতুমঙ্গল! ত্বং প্রসাদয়ামি॥ ২॥—বসন্তের জীবনসর্বস্ব, হে বসন্ত ঋতুর প্রাণস্বরূপ ঈষৎতাম্র-হরিতপাণ্ডুবর্ণ আম্রমুকুল, তুমি প্রসন্ন হও। প্রথমা বল্ছে ঃ—মধুকরিকে! চূত-কলিকাং দৃষ্টবা উন্মত্তা পরভৃতিকা ভবতি॥ ৪॥—মধুকরিকা, আমের মুকুল দেখে কোকিল পাগল হয়ে যায়।

দ্বিতীয়া বল্ছে ঃ—সখি! অবলম্বস্ব মাং যাবৎ অগ্রপাদস্থিতা ভূত্বা চূত-কলিকাং গৃহীত্বা কামদেবার্চ্চনং করোমি॥ ৭॥—সখি, ধর আমাকে, আমি পায়ের ডগায় ভর করে আমের মুকুল তুলে কন্দর্পদেবের অর্চনা করি। প্রথমা বল্লো ঃ—যদি তোর পুণ্যফলের অর্ধেকও আমাতে বর্তায় তো আমি রাজী। দ্বিতীয়া ঃ—অয়ে অপ্রতিবুদ্ধঃ অপি চূতপ্রসবঃ অত্র বন্ধনভঙ্গসুরভিঃ ভবতি॥ ৯॥ আমের মুকুল এখনো ভালো করে ফোটেনি তবুও বোঁটা ভাঙগায় কি সুন্দর গন্ধ বের হচ্ছে।

ত্বমসি ময়া চূতাঙ্কুর! দত্ত কামস্য গৃহীতধনুষঃ।
পথিকজনযুবতিলক্ষ্যঃ পঞ্চাভ্যধিকঃ শরঃ ভবঃ॥ ১০॥
তোমারে সঁপিনু হে চূতমুকুল পুষ্পধন্বা-কাছে,
পাঁচটি বাণের সেরা হও তুমি, হে বনের বিস্ময়,
বসন্তকালে যে পথিকদল সুদূর প্রবাসে আছে,
যেন বিরহিনী পথিক-বধূরা তোমার লক্ষ্য হয়।

রাজার আদেশে বসন্ত-উৎসব বন্ধ। দুটি সখি প্রমোদকাননে বেড়াতে এসে আমের মুকুল তুলে ছড়াচ্ছে। এমন সময়ে কঞ্চুকীর প্রবেশ। সে মেয়েদুটিকে ধমক দিয়ে বল্লে—জানো না বসন্তোৎসব বন্ধ রাজার আদেশে! দেখছো না ঃ—

চূতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বং রজঃ।
সন্নদ্ধং যদাপি স্থিতং কুরবকং তৎ কোরকাবস্থায়া
কণ্ঠেষু স্খলিতং গতেঽপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতং
শঙ্কে সংহরতি স্মরোঽপি চকিতস্তূর্ণাদ্ধ কৃষ্টং শরম্॥ ১৩॥
আম্রমুকুল কবে দেখা গেছে নাহি পরাগের লেশ,

প্রস্ফুট-প্রায় কুরবকগুলি কুঁড়ি হয়ে থেকে গেলো,
কোকিল-কণ্ঠে সুর বেধে গেলো, যদিও শীতের শেষ,
মদনের তূণে আধো-বার-করা সায়কটি ফিরে এলো।

বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্-এর দ্বিতীয় অংকে এই শ্লোকটি আছে ঃ—
ইদমসুলভবস্তুপ্রার্থনাদুর্নিবারং প্রথমমপি মে পঞ্চবাণঃ ক্ষিণোতি।
কিমুত মলয়বাতোন্মুলিতপান্ডুপত্রৈরুপবনসহকারৈর্দর্শিতেষ্বংকুরেষু॥ ৪৫॥
দুর্লভ জনে পাবার তরেতে পাগল পরাণ মম,
পঞ্চ শরেতে খুঁড়িছে হৃদয় নিঠুর পঞ্চশর,
দখিন পবনে চূতমঞ্জরী হয়েছে সঞ্চালিত
ঝরে ঝরাপাতা তাহে ফের যেন জ্বলে ওঠে অন্তর।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর তৃতীয় অংকে মধুঋতুর বর্ণনা করে কবি বল্‌ছেন ঃ—
উন্মত্তানাং শ্রবণসুভগৈ-কূজিতৈ-কোকিলানাং
সানুক্রোশং মনসিজরুজঃ সহ্যতাং পৃচ্ছতেব।
অংগে চূতপ্রসবসুরভির্দক্ষিণো মারুতো মে
সান্দ্রস্পর্শঃ করতল ইব ব্যাপৃতো মাধবেন॥ ২৭॥
মত্ত কোকিল কূজনে শুধায় বসন্ত ঋতু মোরে,
যে বেদনা দেছে মদন সে ব্যথা হয়েছে কি সহনীয়?
আম্রমুকুলসৌরভভরা দক্ষিণ সমীরণ
মদনের সুখ-কর-পরশন সম লাগে রমণীয়।

তৃতীয় অংকে দেখি নিপুণিকা ইরাবতীকে বল্‌ছেন ঃ—আলোকয়তু ভট্টিনী! চূতাঙ্কুরং বিচিন্বত্যোঃ আবয়োঃ পিপীলিকাভিঃ দৃষ্টম্॥ ৭৮॥—দেখ ভট্টিনী, আম্রমুকুল চয়ন করতে এসে আমরা যেন পিঁপড়ের কামড় খাচ্ছি।

সেই তৃতীয় অংকেই আছে ঃ—মুগ্ধে! ভ্রমসংবাধঃ অস্তীতি বসন্তাবতারসর্ব্বস্বং কিং ন নবচূতপ্রসবঃ অবতংসনীয়? ॥ ১০॥—মুগ্ধে, কেউ কি ভ্রমরের ভয়ে বসন্তের সর্বস্ব ধন যে নবপ্রস্ফুট আম্রমঞ্জরী সেই মঞ্জরীর কর্ণভূষণ পরতে বিরত থাকে?

মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর চতুর্থ অংকে রাজা বল্‌ছেন ঃ—
মধুরস্বরা পরভৃতা ভ্রমরী চ বিবুদ্ধচূতসঙ্গিন্যৌ।
কোটরমকালবৃষ্ট্যা প্রবলপুরোবাতয়া গমতে॥ ২১॥
মধুরকণ্ঠী কোকিলা ও অলি আম্রমুকুল সাথে
পরমানন্দে প্রেমের লীলায় ছিল দোঁহে নিমগন,

কোথা হতে এসে অকালবৃষ্টি প্রতিকূল বায়ুযোগে
দিল পাঠাইয়া বৃক্ষকোটরে, ভাগ্যের নিপীড়ন।

রঘুবংশম্-এর একোনবিংশ সর্গে বসন্তের এই মোহিনী বর্ণনা রয়েছে ঃ—

দক্ষিণেন পবনেন সম্ভৃতং প্রেক্ষ্য চূত-কুসুমং সপল্লবম্।
অন্বনৈষুরবধূত বিগ্রহাস্তং দুরুৎসহবিয়োগমঙ্গলাঃ॥ ৪৩॥

দখিন বাতাস রোমাঞ্চ আনে আম্রমুকুলদলে,
নবকিশলয় মাঝে বিকশিত হেরি চূতমঞ্জরী,
উন্মনা হয়ে বিরহিনী সবে অভিমান ভুলে গিয়ে
অসহ বিরহে তাহার শরণ নিতো প্রেমরসে ভরি।

দেবরাজ ইন্দ্র মদনকে স্মরণ করলেন শিবের তপোভঙ্গের জন্যে। স্মরণমাত্র সখা বসন্তকে নিয়ে মদন এসে হাজির। কুমারসম্ভবম্-এর দ্বিতীয় সর্গে পড়ি ঃ—

অথ স ললিতযোষিদ্ভ্রূলতাচারুশৃঙ্গং রতিবলপদাঙ্কে চাপমাসজ্যকণ্ঠে।
সহচরমধুহস্তন্যস্তচূতাঙ্কুরাস্ত্রঃ শতমুখমুপতস্থে প্রাঞ্জলিঃ পুষ্পধন্বা॥ ৬৪॥

রতির বলয়-চিহ্নিত গলে শোভিতেছে ফুলধনু,
রমণীর বাঁকা ভ্রূলতার সম ধনুখানি মনোহর,
আম্রমুকুল-সায়ক হস্তে সখা বসন্ত সাথে
ইন্দ্রের কাছে দাঁড়াল মদন জোড় করি দুই কর।

কুমারসম্ভবম্-এর তৃতীয় সর্গে আমের মুকুলের কষায় রসে কোকিলের স্বর আরো মিষ্টি হবার কথা রয়েছে ঃ—

চূতাঙ্কুরস্বাদকষায়কণ্ঠঃ পুংস্কোকিলো যন্মধুরং চুকূজ।
মনস্বিনীমানবিঘাতদক্ষং তদেব জাতং বচনং স্মরস্য॥ ৩২॥

আম্রমুকুল কষায় রসেতে সিক্ত কণ্ঠ-স্বর
করিছে কোকিল মহা-আনন্দে মধুর কূজন-গান,
অতনুর বাণী সম কুহুডাক প্রবেশিল অন্তরে
ঘুচে গেলো অভিমানিনী নারীর বুক-ভরা অভিমান।

কুমারসম্ভবম্-এর চতুর্থ অঙ্কে চূত-মঞ্জরীর উপর দুটি মনোহর শ্লোক আছে। শ্লোকটি ঃ—

হরিতারুণচারুবন্ধনঃ কলপুংস্কোকিলশব্দসূচিতঃ।
বদ সম্প্রতি কস্য বাণতাং নবচূতপ্রসবো গমিষ্যতি॥ ১৪॥

হরিত-অরুণ বৃন্তে উঠিবে আম্র-মুকুল ভরি,
জানাবে কোকিল ফুটেছে মুকুল মধুর কূজন করে,
তোমার বিহনে হে কুসুমধনু সেই চূতমঞ্জরী
কার ধনুকের সায়ক হইবে বলে দাও তুমি মোরে।

দ্বিতীয় শ্লোকটি ঃ—

পরলোকবিধৌ চ মাধব! স্মরমুদ্দিশ্য বিলোলপল্লবাঃ।
নিবপেঃ সহকারমঞ্জরীঃ প্রিয়-চূতপ্রসবো হি তে সখা॥ ৩৮॥

হে মাধব যবে আমারে স্মরিয়া করিবে স্বস্ত্যয়ন,
কিশলয়-মেশা আম্র-মুকুল দিও তুমি মোরে স্মরি,
সখা, জানো তুমি তোমার বন্ধু মদন সে অভাজন
কতো ভালোবাসে নবপ্রস্ফুট আম্রের মঞ্জরী।

ঋতুসংহারম্-এর ষষ্ঠ সর্গে বসন্ত বর্ণনায় আম্র-মঞ্জরী পাঁচ বার মহাকবির মন ভুলিয়েছে। বসন্ত বর্ণনার প্রথম শ্লোকেই আমের মুকুল দেখা দিয়েছে ঃ—

প্রফুল্ল চূতাঙ্কুরতীক্ষ্ণসায়কো দ্বিরেফমালাবিলসদ্ধনুর্গুণঃ।
মনাংসি বেদ্ধুং সুরতপ্রসঙ্গিনাং বসন্তযোধঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে॥ ১॥

অয়ি প্রিয়ে হের আম্রমুকুলসায়ক শোভিছে করে,
ধনুকের গুণ রচেছে ভ্রমরদলে,
সুরতবিলাসী কামিদের মন করিবারে বিদীরণ,
বসন্ত-বীর আসিয়াছে ধরাতলে।

পুংস্কোকিলশ্চূতরসাসবেন মত্তঃ প্রিয়াং চুম্বতি রাগহৃষ্টঃ।
কূজন্দ্বিরেফোঽপ্যয়মম্বুজস্থঃ প্রিয়ং প্রিয়ায়াঃ প্রকরোতি চাটু॥ ১৪॥

আম্রমুকুলমধুমাতোয়ালা কোকিলেরা বনতলে
কোকিল প্রিয়ারে চুম্বিছে অনুরাগে,
শতদল-বুকে করিছে ভ্রমর গুঞ্জন মনোরম
তুষিতে প্রিয়ারে মৃদুগুঞ্জনরাগে।

তাম্রপ্রবালস্তবকাবনম্রাশ্চূতদ্রুমাঃ পুষ্পিতচারুশাখাঃ।
কুর্বন্তি কামং পবনাবধূতাঃ পর্য্যুৎসুকং মানসমঙ্গনানাম্॥ ১৫॥

রক্তবরণ নবপল্লবে আনত আম্রতরু
শাখাগুলি তার ফুলে ফুলে গেছে ভরে,
উতল পবনে কম্পিত হয়ে আজিকে রসাল তরু
আকুল করিয়া রমণীর মন হরে।

মত্তদ্বিরেফপরিচুম্বিতচারুপুষ্পা মন্দানিলাকুলিত নম্রমৃদুপ্রবালাঃ।
কুর্ব্বন্তি কামিমনসাং সহসোৎসুকত্বং চূতাভিরামকলিকাঃ সমবেক্ষ্যমাণাঃ॥ ১৭॥

মত্ত ভ্রমর চুমিছে সোহাগে চূততরুমঞ্জরী
কাঁপিছে পবনে সহকার পাতাগুলি,
এ ছবি হেরিয়া কামে উন্মন নবযুবকের দল,
পরাণ তাদের উঠিয়াছে বিয়াকুলি।

আম্রমঞ্জুলমঞ্জরীবরশরং সৎ কিংশুকং যদ্ধনুর্জ্যা
যস্যালিকুলং কলঙ্করহিতশ্ছত্রং সিতাংশুঃ সিতম্।
মত্তেভো মলয়ানিলঃ পরভৃতা যদ্বন্দিনো লোকজিৎ
সোহয়ং বো বিতরী তরীতু বিতনুর্ভদ্রং বসন্তান্বিতঃ॥ ২৮॥

মঞ্জুল চূত-মঞ্জরী দল রচেছে ধনুর শর,
কিংশুক ফ্ল রচেছে যাহার ধনু,
ধনুকের গুণ রচেছে যাহার অলিকুল মনোহর,
জোছনা রচেছে শ্বেতছত্রের তনু।
মলয় পবন সেবিছে যাহারে মত্ত বারণ সম,
কোকিল যাহার গাহে বন্দনা গান,
সাথে লয়ে সখা বসন্তে আজি অনঙ্গ নিরুপম
সবে মঙ্গল করুক নিত্য দান।

একচল্লিশ—পদ্ম

ভারতবর্ষের বড়ো আদরের ফ্ল পদ্ম। এতো ফ্ল থাকতে পদ্ম যে কেন এতো মর্যাদা পেলো তা জানিনে। এই ফ্ল রূপের দাবী নিশ্চয়ই করতে পারে কিন্তু সৌন্দর্যে পলাশ, অশোক, নাগকেশর, জবা, এরাই বা পদ্মের চেয়ে কম কিসে? তবে আয়তনে পদ্ম এদের হার মানায়। তবে কি রূপের মর্যাদা আয়তনে? তা হোলে তো গন্ডারের সৌন্দর্য হরিণের চেয়ে অনেক বেশী। আধুনিককালে অবিশ্যি আয়তনের ও সংখ্যার আধিক্যই বস্তুর শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করছে। কিন্তু এটাতো রুচিহীন যুগ, মোটা সুরের যুগ। কিন্তু সেকাল? সেকালেও কি তাই ছিলো? গন্ধ বল্‌তে পদ্মের বিশেষ কিছুই নেই। শরতের শিউলি, বর্ষার বকুল, ব্যথার মতো প্রাণ-আচ্ছন্ন-করা, দেহের প্রতিটি-শিরা-অবশ-করা এদের সৌরভ। এমন গন্ধ আর কোন ফুলের আছে? মনে হচ্ছে আয়তনের দাবী সে দিনও ছিলো, বিশেষ করে রাজদরবারে আর সুন্দরীদের কাছে। তাই পদ্ম নিয়ে এতো বাড়াবাড়ি।

পদ্ম সম্বন্ধে ও পদ্মকে তুলনার বস্তু করে একশো বাইশটি শ্লোক লিখেছেন

কালিদাস—মেঘদূতম্-এ তেরোটি, ঋতুসংহারম্-এ সাতাশটি, বিক্রমোর্বশীয়ম্-এ তিন, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এ ছয়, রঘুবংশম্-এ সাঁয়ত্রিশ, মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এ চার আর কুমারসম্ভবম্-এ বত্রিশ। শাদা পদ্ম (পুণ্ডরীক), লাল পদ্ম (কহ্লার) ও নীল পদ্ম (কুবলয়), এই তিন রঙের পদ্মই তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে নিজেদের গৌরবে ও তুলনার প্রয়োজনে।

মেঘদূতম্-এ পদ্মের কথা বার বার এসেছে। নিখিল-চিত্তবিমোহিনী অলকা নগরীতেই শুধু কমল ফোটে না. রামগিরি থেকে অলকায় যাবার পথে মেঘের মন দোলাবে পদ্ম। যক্ষ মেঘকে আশ্বাস দিচ্ছে যে অলকায় যাবার সময়ে তাকে নিঃসঙ্গ যেতে হবে না। যে বলাকারা পদ্মের মৃণাল মুখে নিয়ে মানস সরোবরের দিকে যাবে তারা মেঘের সাথী হবে। মেঘদূতম্-এর পূর্বমেঘ খণ্ডে তার বর্ণনা আছে ঃ—

কর্ত্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং
তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জ্জিতং মানসোৎকাঃ।
আকৈলাসাদ্ বিসকিসলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ
সম্পৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ॥ ১১॥

মেঘগর্জনে ফোটে ভূঁইচাপা ধরণীর বুকচিরে.
হংসবলাকা মেঘগর্জনে মানসের লাগি মাতি
মৃণাল-পাথেয় লয়ে যবে ধায় মানসসরসী-তীরে,
কৈলাসগিরিযাত্রী তোমার হবে মরালেরা সাথী।

কৈলাসে যাবার পথে যখন সুন্দরী বিশালা নগরীতে গিয়ে মেঘ পৌঁছবে তখন কি আনন্দই না মেঘ পাবে! বিশালার সৌন্দর্যের কি তুলনা আছে। সেখানে

দীর্ঘকুর্ব্বন্ পটুমদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ.
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনা-চাটুকারঃ॥ ৩১॥

কমল-গন্ধে প্রভাতসমীর আমোদিত উন্মন.
সারস পাখীর মধুর কূজন ভেসে আসে মনোরম.
শিপ্রানদীর শীকর-শীতল যেথা ঊষা-সমীরণ,
সুরত-ক্লান্তা নারীর প্রান্তি হরে প্রিয়তম সম।

তাই বলে শুধু কমলের শোভা দেখলেই চল্‌বে না। উজ্জয়িনীতে গন্ধবতীর তীরে মহাকালের মন্দির। সেখানে যেতে মেঘ যেন কখনো না ভুলে যায়।

ভর্ত্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ

পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডীশ্বরস্য।
ধূতোদ্যানং কুবলয়রজোগন্ধিভির্গন্ধবত্যা
স্তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতিস্নানতিক্তৈর্মরুদ্ভি॥ ৩৩॥
নীলকণ্ঠের কণ্ঠবরণ তোমারে হেরিবে প্রমথেরা অনুরাগে,
স্ফুটশতদল ও যুবতীদলের স্নান-সুবাসিত গন্ধবতীর নীর,
সেই সুগন্ধ বহে আনে বায়ু, উপবনে ফুলে পবন-পরশ লাগে,
যেও মেঘ যেথা ত্রিভুবনগুরু মহাকাল-মন্দির।

যক্ষ কি করে ভুলে যায় উজ্জয়িনীর খণ্ডিতা নারীদের কথা! সে তো নিজেই প্রেমকলানিপুণ। সে যে তার খণ্ডিতা প্রিয়ার অশ্রুজল কখনো মোছে নি, এ কি করে ধরে নেওয়া যায়। আর যে ভাবে যক্ষ খণ্ডিতা নারীদের কথা মেঘকে জানাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে তার প্রিয়ার অবস্থাই তার মনে পড়ছে!

তস্মিন্ কালে নয়নসলিলং যোষিতাং খণ্ডিতাম্
শান্তিং নেয়ং প্রণয়িভিরতো বর্ত্ম ভানোস্ত্যজাশু।
প্রালেয়াস্ত্রং কমলবদনাৎ সোঽপি হর্তুং নলিন্যাঃ
প্রত্যাবৃত্তস্ত্বয়ি কররুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ॥ ৩৯॥
মোছে প্রেমিকেরা প্রত্যূষকালে বধূদের আঁখিজল,
সূর্যের পথ তাই হে বন্ধু করিও না যেন রোধ,
মোছে উষা-রবি নলিনীর মুখ আঁখিজল-উচ্ছল,
বাধা দাও যদি উপজিবে সখা প্রভাত-রবির ক্রোধ।

তার পরে উজ্জয়িনী ছেড়ে গম্ভীরা নদী পিছনে ফেলে হে মেঘ তোমাকে দেবগিরিতে যেতে হবে। সেখানে কার্তিকেয়ের চির-বসতি। দেবগিরিতে মন্দ্রধ্বনি কোরো, ময়ূরেরা সেই ধ্বনি শুনে নৃত্য করবে।

জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী
পুত্রপ্রেম্না কুবলয়দলপ্রাপি কর্ণে করোতি।
ধৌতাপাঙ্গং হরশশিরুচা পাবকেস্তুং ময়ূরং
পশ্চাদদ্রিগহণগুরুভির্গর্জ্জিতৈর্নর্ত্তয়েথাঃ॥৪৪॥

যাহার বর্হ খসিয়া পড়িলে ভবানী পরমাদরে
কানের কমল-আভরণ ফেলি খনরণ আমন কানে,
শিবের মৌলি-কিরণে শুভ্র যার আঁখি শোভা ধরে
সেই কলাটীরে নাচাইয়ো তুমি গুরুগর্জনতানে।

পথের শেষ তো একদিন হতেই হবে। মেঘেরও যাত্রা একদিন ফুরালো।

মেঘদূতম্-এর পূর্বমেঘ খণ্ডের সমাপ্তি হোলো কৈলাস গিরিতে মেঘের পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে। আর সেই কৈলাসও কি কম সুন্দর!

হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ
কুর্ব্বন্ কামং ক্ষণমুখপটপ্রীতিমৈরাবতস্য।
ধুন্বন্ কল্পদ্রুমকিশলয়ান্যংশুকানীব বাতৈ—
নানাচেষ্টৈর্জলদ ললিতৈর্নির্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্॥ ৬২॥

স্বর্ণকমলপরাগবাসিত মানসের জল পিয়া
ঐরাবতের মুখ পরে রচো ক্ষণিকের আবরণ,
কল্পতরুর কিশলয়গুলি রেশমীবস্ত্রসম মৃদু কাঁপাইয়া,
ললিতবিলাসে কৈলাসে তুমি ভোগ কোরো অনুখন।

তারপর মেঘদূতম্-এর উত্তর মেঘ খণ্ডে যক্ষ অলকার ও তার প্রিয়ার বর্ণনা নিয়ে মেতে গেল। অলকার সুন্দরীদের ছলাকলার কি শেষ আছে!

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম্।
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষম্
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥ ২॥

বধূদের হাতে লীলার কমল কুন্দ কুসুম অলকে,
পাণ্ডু আননে আনিয়াছে শ্রী লোধ্র-রসের ঝলকে।
বেণীতে তাদের নবকুরবক কর্ণে শিরীষ অতুল,
সীঁথিতে তাদের বর্ষার দূতী নব কদম্ব দোদুল।

শুধু কি তাই?

গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্রমন্দারপুষ্পৈঃ
পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈঃ
নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্॥ ১১॥

চলার বেগেতে কেশ হতে ঝড়ে পড়ে পথে মন্দার,
ঝরে কর্ণের স্বর্ণকমল, বুকের পত্রলেখা,
লুটায় ধুলায় মুক্তার জাল, ছিন্ন কণ্ঠ-হার,
প্রভাতের বুকে অভিসারিকার শর্বরী-লীলা লেখা।

এ তো গেলো অলকার বধূদের কথা, কিন্তু অলকা? তার সৌন্দর্যও কি কম!

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পাঃ
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠাভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপাঃ
নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহত ত সোবৃত্তিরস্যাঃ প্রদোষাঃ॥ ৩॥

যেথা তরুদল সদা ফুলেভরা মুখরিত থাকে নিতি অলিগুঞ্জনে,
চিরপ্রস্ফুট নলিনীরে ঘিরে হংসের দল রচিছে চন্দ্রহার,
সদা-উজ্জ্বল শিখির কলাপ, বাজে কেকাধ্বনি নিতি বনে উপবনে,
যেথায় সন্ধ্যা নিত্য-জ্যোৎস্না, কভুও সাঁঝেতে নাহিক অন্ধকার।

এবারে সুরু হোলো যক্ষের নিজের বাড়ির বর্ণনাঃ—

বাপী চাস্মিন্ মরকত শিলাবন্ধসোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদূর্যনালৈঃ।
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং
নাধ্যাসন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্য হংসা॥ ১৫॥

ভবনে আমার রাজে সরোবর মরকতশিলারচিত সোপান তার,
বৈদূর্যমণিরচিত মৃণালে স্বর্ণকমল ফোটে সেই সরোবরে,
মরালের দল সেই সরোবরে বিরাজে চমৎকার
নিকটে হলেও যায় না মানসে মরালেরা ক্ষণ তরে।

এখন যক্ষের ভবন মেঘ চিন্‌বে কি করে?

এভিঃসাধো হৃদয়নিহিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষয়েথাঃ
দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ চ দৃষ্টবা।
ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্বিয়োগেন নূনং
সূর্যাপায়ে ন খলুং কমলং পুষ্যাতিস্বামভিখ্যাম্॥ ১৯॥

এই লক্ষণে চিনিবে হে সাধু তুমি মোর গৃহখানি,
শঙ্খপদ্মে ধনের অঙ্ক লেখা যেথা দ্বারদেশে,
আমার বিয়োগে সে ভবন এবে শ্রীহীন হয়েছে জানি,
কমলের শোভা রহে কি যখন সূর্য আঁধারে মেশে!

শুধু কি গৃহই শ্রীহীন হয়েছে! যক্ষ-প্রিয়ার অবস্থা কি কম শোচনীয়!

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়িসহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।

গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ ॥ ২২ ॥

স্বল্পভাষিণী সেই সুন্দরী আমার দ্বিতীয় প্রাণ,
আমার বিহনে চক্রবাকীর সম বালা একাকিনী,
প্রবল বিরহ-অনলে-তাপিতা তারে হয় অনুমান
শিশির-কাতর ম্লান শতদল যেন মোর বিরহিনী।

রুদ্ধাপাঙ্গ প্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসাম্।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা
মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয় শ্রীতুলামেষ্যতীতি ॥ ৩৪ ॥

আঁখি-কোণে পড়ি রুক্ষ চূর্ণ-কুন্তল অভিনব,
মদিরা ত্যেজেছে, ভ্রূবিলাসলীলা গেছে বিরহিনী ভুলি,
তোমারে হেরিয়া কাঁপিবে প্রিয়ার নয়নের পল্লব,
মনে হয় বুঝি মীন-কম্পিত-পদ্মের দলগুলি।

কবির তরুণ বয়েসে লেখা ঋতুসংহারম্ কাব্য। এই কাব্যে নেই মেঘদূতম্-এর প্রশান্ত সৌন্দর্য কিম্বা গভীরতা। এই কাব্যে ঋতুগুলির বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী আছে প্রতিটি ঋতুতে বিলাসিনীদের প্রসাধন-নৈপুণ্যের ও বিলাস-বিভ্রমের বর্ণনা। সেই বর্ণনায় নানাভাবে নানা লীলায় পদ্মকে স্মরণ করেছেন কবি। একটিও ঋতু-বর্ণণাতে পদ্ম বাদ পড়ে নি। ছ'টি ঋতুর ডালিতেই কবি পদ্ম সাজিয়েছেন, অবিশ্যি ঋতুর বর্ণনা তাঁর ততোটা লক্ষ্য নয় যতোটা লক্ষ্য বিলাসিনীদের বর্ণনা। বিলাসের সামগ্রী হিসেবে শতদল বর্ণিত হয়েছে, প্রয়োজনের ধূলায় অবগুণ্ঠিত হয়ে পদ্মের সৌন্দর্য অবমানিত হয়েছে ঋতুসংহারম্-এ। ঋতুসংহারম্-এর প্রথম সর্গে গ্রীষ্ম-বর্ণনায় কবি বলছেন—

সমুদ্ধৃতাশেষমৃণালজালকং বিপন্নমীনং দ্রুতভীতসাগরম্।
পরস্পরোৎপীড়নসংহতৈর্গজৈঃ কৃতং সরঃ সান্দ্রবিমর্দ্দকর্দ্দমম্ ॥ ১৯ ॥

মৃণাল তুলিয়া ফেলে চারিদিকে বিনাশে মৎসদলে,
তাড়া খেয়ে ভয়ে পালায় সারসদল,
মত্ত গজেরা সরোবর মাঝে আঘাতি পরস্পরে
কর্দম করি তোলে সায়রের জল।

দ্বিতীয় সর্গে বর্ষা-বর্ণনায় পদ্মের দিকে একটু বেশী নজর পড়েছে কবির—

নিতান্তনীলোৎপলপত্রকান্তিভিঃ ক্বচিৎ প্রভিন্নাঞ্জনরাশিসন্নিভৈঃ।
ক্বচিৎ সগর্ভপ্রমদাস্তনপ্রভৈঃ সমাচিতং ব্যোম ঘনৈঃ সমন্ততঃ॥ ২॥

কোথাও বা নীল উৎপলসম সঘন-নীলিমা-মাখা
কোথাও বা ঘন কজ্জল সম কালো,
কোথাও বা নারী গর্ভবতীর স্তনের বরণ আঁকা
আকাশ ছাইয়া মেঘদল টলমলো।

কমলবনচিতাম্বু পাটলামোদরম্যঃ সুখসলিলনিষেকঃ সেব্যচন্দ্রাংশুহারঃ।
ব্রজতু তব নিদাঘঃ কামিনীভিঃ সমেতো নিশি সুললিতগীতে হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে সুখেন॥ ২৮॥

ভালো লাগে হিম-সলিলে সিনান মধুর জোছনা যে কালে,
ফোটে শতদল পাটল ফলের গন্ধ লুটায় কাননে,
সে নিদাঘকালে মধু নিষীথিনী সুললিত গীত-গানে
নারীদের সাথে কাটুক কুসুম-শয়নে।

বিলোলনেত্রোৎপলশোভিতাননৈর্মৃগৈঃ সমন্তাদুপজাতসাধ্বসৈঃ।
সমাচিতা সৈকতিনী বনস্থলী সমুৎসুকত্বং প্রকরোতি চেতসঃ॥ ৯॥

ভয়ে সচকিত শতদল-আঁখি হরিণেরা দলে দলে
চঞ্চল হয়ে বনতলে ঘুরে মরে,
তটিনীতীরের শ্যামবনতল কি শোভা ধ'রেছে আজ
দেখিবার লাগি সবে উৎসুক করে।

বিলোচনেন্দীবর বারিবিন্দুভির্নিষিক্তবিম্বাধরচারুপল্লবাঃ।
নিরস্তমাল্যাভরণানুলেপনাঃ স্থিতা নিরাশাঃ প্রমদাঃ প্রবাসিনাম্॥ ১২॥

কমলনয়ন হতে ঝরে-পড়া নয়নের জল-মাখা
সিক্ত অধর-পল্লব সুমোহন,
চন্দন মালা আভরণ ত্যজি বিরহিনী রমণীরা
নিরাশায় দিন করিছে উদ্‌যাপন।

বিপন্নপুষ্পাং নলিনীং সমুৎসুকা বিহায় ভৃঙ্গাঃ শ্রুতিহারিনিস্বনাঃ।
পতন্তি মূঢ়াঃ শিখিনাং প্রনৃত্যতাং কলাপচক্রেষু নবোৎপলাশয়া॥ ১৪॥

মধু বিতরিতে অধীরা আকুলা নলিনীরে পরিহরি
মধুগুঞ্জন করি মধুপের দল,
নববিকশিত কমল ভাবিয়া ময়ূরপুচ্ছ পরে
বসিতেছে আসি করি মৃদু কোলাহল।

সিতোৎপলাভাম্বুদচুম্বিতোপলাঃ সমাচিতাঃ প্রস্রবণৈঃ সমন্ততঃ।
প্রবৃত্তনৃত্তৈঃ শিখিভিঃ সমাকুলাঃ সমুৎসুকত্বং জনয়ন্তি ভূধরাঃ॥ ১৬॥

শ্বেতশতদলবরণ মেঘেরা চুমিছে গিরির কায়া,
বর্ষাধারয়ে পূর্ণ নদীরা ধায়,
নৃত্যচপল ময়ূরের দলে পূর্ণ ভূধর আজি
সবার চিত্ত উতল করিছে তায়।

কুবলয়দলনীলৈরুন্নতৈস্তোয়নম্রৈঃ মৃদুপবনবিধূতৈর্মন্দমন্দং চলদ্ভিঃ।
অপহৃতমিবচেতস্তোয়দৈঃ সেন্দ্রচাপৈঃ পথিকজনবধূনাং তদ্বিয়োগাকুলানাম্॥ ২২॥

নীল-উৎপল-সুনীল-বরণ জলভারানত মেঘ,
মৃদু বায়ুভরে ধীরে ধীরে ভেসে যায়,
বিরহিনীদের মন চুরি করে আজিকে মেঘের দল,
ইন্দ্রধনুর বরণেতে শোভা পায়।

ঋতুসংহারম্-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ-ঋতুর বর্ণনা। সেখানেও পদ্ম ও পদ্মের উপমা অনেকবার এসেছে।

ব্যোম কৃচিদ্রজতশঙ্খমৃণালগৌরৈস্ত্যক্তাম্বুভির্লঘুতয়া শতশঃ প্রয়াতৈঃ।
সংলক্ষ্যতে পবনবেগচলৈঃ পয়োদৈঃ রাজেব চামরবরৈরুপবীজ্যমানঃ॥ ৪॥

শ্বেত শতদল ও শঙ্খের ন্যায় শুভ্রবরণ মেঘ
শত দিকে ধায়, অতি লঘু হয়ে জলবর্ষণ করে,
উতল পবনে চঞ্চল মেঘ-চামরের হাওয়া খেয়ে
আকাশ আজিকে নৃপতির শোভা ধরে।

কারণ্ডবাবলিবিঘট্টিতবীচিমালাঃ কাদম্বসারসকুলাকুলতীরদেশাঃ।
কুর্ব্বন্তি হংসবিরুতৈঃ পরিতো জনস্য প্রীতিং পরাং কমলরেণুবৃতাস্তটিন্যঃ॥ ৮॥

তটিনীর ঢেউ করে খণ্ডিত কারণ্ডবের দল,
মরাল ও সারস তটেরে আকুল করে,
হংসদলের কল-মুখরিত কমল-রেণুতে ছাওয়া
নদীতীর আজ সবার চিত্ত হরে।

আকম্পয়ন্ ফলভরানতশালি জালান্যানর্ত্তয়ংস্তরুবরান্ কুসুমাবনম্রান্।
প্রোৎফুল্লপঙ্কজবনাং নলিনীং বিধুন্বন্ যূনাং মনশ্চলয়তি প্রসভং নভস্বান্॥ ১০॥

বায়ু-কম্পিত শালি ধান্যের পক্ব শীর্ষগুলি
পবনে নৃত্য করে ফুলভারে নত কুরবকদল,
পঙ্কজবনে পদ্মিনীদলে কম্পিত করি বায়ু
করে যুব-মন অস্থির চঞ্চল।

সোন্মাদহংসমিথুনৈরুপশোভিতানি স্বচ্ছপ্রফুল্লকমলোৎপলভূষিতানি।
মন্দপ্রভাত-পবনোদ্গতবীচিমালান্যুৎকণ্ঠয়ন্তি সহসা হৃদয়ং সরাংসি॥১১॥

মত্তমরালমিথুনে শোভিত দীঘির তরল বুকে
ফুল্ল কমল ও উৎপলদল ফুটিয়াছে আলো করি,
মন্দমধুর প্রভাত-পবনে সায়রে উঠেছে ঢেউ,
চিত উতরোল শরতের দিনে উদাস ভাবনা ভরি।

হংসৈর্জিতা সুললিতাগতিরঙ্গনানামম্ভোরুহৈর্বিকসিতৈ র্মুখচন্দ্রকান্তিঃ
নীলোৎপলৈর্মদকলানি বিলোকিতানি ভ্রূবিভ্রমাশ্চ রুচিরাস্তনুভিস্তরঙ্গৈঃ॥১৭॥

কলহংসেরা শেখে রমণীর সুললিত মৃদুগতি
শতদলে রাজে রমণী-মুখের তুলনা,
নীল-উৎপলে শোভে কামিনীর মুগ্ধ দৃষ্টিছবি
নদীতরঙ্গে রমণী-ভুরুর ছলনা।

হারৈঃ সচন্দনরসৈঃস্তনমণ্ডলানি শ্রোণীতটং সুবিপুলং রসনাকলাপৈঃ।
পাদাম্বুজানি কলনূপুরশেখরৈশ্চ নার্য্যঃ-প্রহৃষ্টমনসোঽদ্য বিভূষয়ন্তি॥ ২০॥

চন্দনরসসিক্ত হারটি দোলায় স্তনের পরে,
গুরুনিতম্বে স্বর্ণমেখলা রাজে,
সুমধুর-ধ্বনি মঞ্জীর পায় চরণ-কমলে শোভা,
খুসিভরা মনে আজ রমণীরা সাজে।

দিবসকরময়ূখৈর্বোধ্যমানং প্রভাতে বরযুবতিমুখাভং পঙ্কজং জৃম্ভতেঽদ্য।
কুমুদমপি গতেঽস্তং লীয়তে চন্দ্রবিম্বে হসিতমিব বধূনাম্ প্রোষিতেষু প্রিয়েষু
॥ ২৩॥

প্রভাতসূর্যকিরণ-স্ফুট সুন্দর শতদল
সুন্দরীনারী-আননের শোভা ধরে,

বিরহ-বিধুরা রমণীর হাসি সম কুমুদের শোভা
চন্দ্র অস্ত গেলে ক্ষীণ হয়ে মরে।

অসিতনয়নলক্ষ্মীং লক্ষয়িত্বোৎপলেষু কনিতকনককাঞ্চীং মত্তহংসস্বনেষু।
অধররুচিরশোভাং বন্ধুজীবে প্রিয়াণাং পথিকজন ইদানীং রোদিতি ভ্রান্তচিত্তঃ॥ ২৪॥

প্রিয়ার কমল-নয়নের শোভা-নেহারিয়া শতদলে,
মরাল-কূজনে আভরণ-ধ্বনি স্মরে,
বাঁধুলি কুসুমে হেরিয়া প্রিয়ার চারু-অধরের শোভা,
আজিকে বিরহী প্রবাসীরা কেঁদে মরে।

বিকচকমলবক্ত্রা ফুল্লনীলোৎপলাক্ষী বিকসিতনবকাশশ্বেতবাসো বসানা।
কুমুদরুচিরকান্তিঃ কামিনীবোন্মদেয়ং প্রতিদিশতু শরদ্বশ্চেতসঃ প্রীতিমগ্র্যাম্॥ ২৬॥

নবীন কাশের শ্বেত অংশুকে সোহাগে দেহটি ঘিরে
উৎপল-আঁখি বিকচ-পদ্ম-আননা,
মদ-উন্মনা রমণীর প্রায় প্রীতিতে ভরুক চিত্ত
শারদ-লক্ষ্মী শুভ্র-কুমুদবরণা।

ঋতুসংহারম্-এর চতুর্থ সর্গে হেমন্ত ঋতুর বর্ণনায় হিম-বিবর্ণ পদ্মের ছবি এঁকেছেন মহাকবি।

নবপ্রবালোদ্গমশস্যরম্যঃ প্রফুল্ললোধ্রঃ পরিপক্বশালিঃ।
বিলীনপদ্মঃ প্রপতত্তুষারো হেমন্তকালঃ সমুপাগতোঽয়ম্॥ ১॥

নবকিশলয়ে সুন্দর আজি তরুদল প্রান্তরে
পাকিয়াছে ধান, লোধ্র কুসুম-নত,
বিলীন হয়েছে সায়রে পদ্ম, পড়িছে তুষার ঘন,
হেমন্তকাল আজি প্রিয়ে সমাগত।

কাঞ্চীগুণৈঃ কাঞ্চনরত্নচিত্রৈর্নো ভূষয়ন্তি প্রমদা নিতম্বম্।
ন নূপুরৈর্হংসরুতং ভজদ্ভিঃ পাদাম্বুজান্যম্বুজকান্তিভাঞ্জি॥ ৪॥

রত্নখচিত স্বর্ণমেখলা দিয়ে নিতম্বখানি
নাহিক সাজায় সুন্দরী বিলাসিনী,
হংসের রব বাজে যে নূপুরে সেই মঞ্জীরধ্বনি
চরণ-রাজীবে নাহি বাজে রিনিঝিনি।

গাত্রাণি কালীয়কচর্চ্চিতানি সপত্রলেখানি মুখাম্বুজানি।
শিরাংসি কালাগুরুধূপিতানি কুর্ব্বন্তি নার্য্যঃ সুরতোৎসবায়॥ ৫॥

বরতনুটিরে চর্চিত করে দারুহরিদ্রা দিয়ে,
পত্রলেখাটি মুখ-শতদল পরে,
কালা অগুরুর ধূপে সুবাসিত ঘন কুঞ্চিত কেশ,
সাজে রমণীরা রতি-উৎসব তরে।

প্রফুল্লনীলোৎপলশোভিতানি সোন্মাদকাদম্ববিভূষিতানি।
প্রসন্নতোয়ানি সুশীতলানি সরাংসি চেতাংসি হরন্তি পুংসাম॥ ৯॥

বিকশিত নীল উৎপল দল কি অরূপশোভা ধরে,
মত্ত-মরাল-মুখর সায়র-জলে,
স্বচ্ছ-শীতল সুগভীর বারি নির্মল সরোবরে
পুরুষের মন হরিছে রূপের ছলে।

কাচিদ্বিভূষয়তি দর্পণসক্তহস্তা বালাতপেষু বণিতা বদনারবিন্দম্।
দন্তচ্ছদং প্রিয়তমেন নিপীত-সারং দন্তাগ্রভিন্নমবকৃষ্য নিরীক্ষতে চ॥ ১৩॥

দর্পণ হাতে কোনো নারী তার বদনকমলখানি
সাজায় সোহাগে তরুণ অরুণ রাগে,
প্রিয়-চুম্বিত দংশন-ক্ষত অধরের চারুশোভা
দাঁত দিয়ে ঠোঁট টিপে দেখে অনুরাগে।

অন্যা প্রকামসুরতশ্রমখিন্নদেহা রাত্রিপ্রজাগরবিপাটলনেত্রপদ্মা।
স্রস্তাংসদেশলুলিতাকুলকেশপাশা নিদ্রাং প্রয়াতি মৃদুসূর্যকরাভিতপ্তা॥১৪॥

সুরত-শ্রমে ক্লান্ত দেহটি লুটায় শয্যাপরে,
রাত্রি জাগিয়া নয়ন-কমল রক্তিম আভা ধরে,
শয্যাপ্রান্তে আলুলিত কেশ আকুল হইয়া লোটে,
সুখ নিদ্রায় সুপ্তা রমণী মৃদু সূর্যের করে।

ঋতুসংহারম্-এর পঞ্চম সর্গে শীত-বর্ণনায় এই মনোহর বর্ণনা আছে—

সুগন্ধিনিশ্বাসবিকম্পিতোৎপলং মনোহরং কামরতিপ্রবোধকম্।
নিশাসু হৃষ্টাঃ সহ কামিভিঃ স্ত্রিয়ঃ পিবন্তি মদ্যং মদনীয়মুত্তমম্॥১০॥

নিশ্বাসে-কাঁপা শতদল আজ মদিরায় মিশ্রিত,
জাগায় মদিরা কামের উদ্দীপনা,
শীতের রাত্রে সুন্দরী সবে প্রিয়-বল্লভসাথে
পান করে সুরা পরম হৃষ্টমনা।

ঋতুসংহারম্-এর ষষ্ঠ সর্গে বসন্ত ঋতুর বর্ণনা করেছেন কবি। বসন্তের ছবি কি কখনো পূর্ণ হতে পারে পদ্মকে বাদ দিয়ে?

দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ।
সুখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ সর্ব্বং প্রিয়ে চারুতরং বসন্তে॥২॥

কুসুমিত তরু, সুরভিতবায়ু প্রেমাতুরা নারীদল,
ফুলে ফুলে ভরা সায়র পদ্মে আলা,
সুখময়ী নিশা, রমণীয় দিন, নব বসন্তকালে
সবি ওগো প্রিয়া অপরূপ মধু-ঢালা।

সপত্রলেখেষু বিলাসিনীনাং বক্ত্রেষু হেমাম্বুরুহোপমেষু।
রত্নান্তরে মৌক্তিকসঙ্গরম্যঃ স্বেদোদ্গমো বিস্তরতামুপৈতি॥৭॥

মোহনপত্রলেখা-অঙ্কিত স্বর্ণকমল সম
বিলাসিনীদের নিরুপম মুখপরে,
স্বেদের বিন্দু গৌর আননে রচিয়াছে বিভ্রম,
স্বেদের বিন্দু অমল ধবল মুক্তার শোভা ধরে।

পুংস্কোকিলশ্চূতরসাসবেন মত্তঃ প্রিয়াং চুম্বতি রাগহৃষ্টঃ।
কূজন দ্বিরেফোঽপ্যয়মম্বুজস্থঃ প্রিয়ং প্রিয়ায়াঃ প্রকরোতি চাটু॥১৪॥

আম্রমুকুলমধুমাতোয়ালা কোকিলেরা বনতলে
কোকিল প্রিয়ারে চুম্বিছে অনুরাগে,
শতদলবুকে করিছে ভ্রমর গুঞ্জন মনোরম
তুষিতে প্রিয়ারে মৃদু গুঞ্জন-রাগে।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর দ্বিতীয় অঙ্কে মালবিকাকে দেখে রাজা অগ্নিমিত্র নিজের মনে বলছেন—আজ আমার নয়ন চরম সৌন্দর্য দেখে সার্থক হোলো।

স্ময়মানমায়তাক্ষ্যাঃ কিঞ্চিদভিব্যক্তদশনশোভি মুখম্।
অসমগ্রলক্ষ্যকেশরমুচ্ছ্বসদিব পঙ্কজং দৃষ্টম্॥৩১॥

আয়তনয়না মালবিকা যবে হাসিল মধুর মন্দ,
ঈষৎ-ব্যক্ত দশনের শোভা দেখালো মুখটি তুলি,
মনে হোলো যেন ফুটিয়া উঠেছে শতদল মধুগন্ধ,
অল্প অল্প যাইতেছে দেখা পদ্ম-কেশরগুলি।

রাজা বলছেন বিদূষককে মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর তৃতীয় অংকে—

"ন হি কমলিনীং লব্ধা গ্রাহমবেক্ষতে মাতঙ্গজঃ॥৪৭॥

প্রস্ফুট কমল দেখে মাতঙ্গ কি কখনো জলে নামতে ভয় পায়?

বকুলাবালিকা বলছে মালবিকাকে—

সখি! অরুণশতপত্রম্ ইব শোভতে তে চরণম্। সর্ব্বথা ভর্ত্তুঃ অংক-পরিবর্ত্তিনী ভব ॥ ৯৫ ॥

সখি, অরুণ শতদলের মতো তোমার চরণের শোভা। তুমি চিরদিনের মতো রাজার অংকশায়িনী হও।

অগ্নিমিত্র বলছেন—

অনেন তনুমধ্যয়া মুখরনূপুরারাবিণা
নবাম্বুরুহকোমলেন চরণেন সম্ভাবিতঃ।
অশোক! যদি সদ্য এব মুকুলের্ন সম্পৎস্যসে
মুধা বহসি দোহদং ললিত-কামিসাধারণম্॥১২৮॥

পরশ দিয়েছে অশোক তরুরে ক্ষীণ-কটি সুন্দরী
নূপুর-মুখর অতি কমণীয় কমল-চরণ দিয়া,
হে অশোক, যদি তবুও কুসুমে নাহি সাজ ত্বরা করি,
বুঝিব দোহদ বৃথাই তোমারে সঁপিয়াছে মোর প্রিয়া।

বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্-এর প্রথম অংক। দানবের হাত থেকে উর্বশীকে রক্ষা করে রাজা পুরূরবা বেপথুমতী উর্বশীকে আশ্বাস দিচ্ছেন।

গতং ভয়ং ভীরু সুরারিসংভবং ত্রিলোকরক্ষী মহিমা হি বজ্রিণঃ।
তদেতদুন্মীলয় চক্ষুরায়তং নিশাবসানে নলিনীব পংকজম্॥ ৩৩ ॥

দূর হয়ে গেছে অসুরের ভয় ওগো ভীরু সুন্দরি,
ত্রিভুবন বাঁচে ইন্দ্রের বলে, মিছে কেন ভয় পাও,
নিশি অবসানে পদ্ম যেমন খোলে আঁখি ত্বরা করি
ওগো সুন্দরি, সে মত আয়ত নয়ন মেলিয়া চাও।

বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্-এর চতুর্থ অংক সুরু হচ্ছে আক্ষিপ্তিকা নামিকা গীত

দিয়ে। চিত্রলেখা তার সখি সহজন্যাকে নিয়ে প্রবেশ করবেন, তার সূচনা করছে এই গান।

প্রিয়সখীবিয়োগবিমনাঃ ব্যাকুলা সমুল্লপতি।
সূর্য্যকরস্পর্শবিকসিততামরসে সরোবরোৎসঙ্গে ॥ ১ ॥
প্রিয়তমাসাখিবিরহকাতরা বালা
বিলাপ করিছে সরোবরতীর পরে,
সেই সরোবরে প্রভাত রবির কিরণের পরশনে
শত শতদল অপরূপ শোভা ধরে।

পুরূরবা উর্বশীর বিরহে পাগল-প্রায় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বনে বনান্তরে। যাকে দেখছেন তাকেই উর্বশীর কথা জিজ্ঞেস করছেন। যা দেখছেন তাই উর্বশীর স্মৃতি মনে আনছে। বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্-এর চতুর্থ অঙ্কে এই মধুর শ্লোকটি আছে—

অয়ে! ইদং রুণদ্ধি মাং পদ্মমন্তঃ-কৃণিতষট্পদম্।
ময়া দৃষ্টাধরং তস্যাঃ সশীৎকারমিবাননম্ ॥ ৬০ ॥

একটি ভ্রমর হয়েছে বন্দী এই শতদল-বুকে,
বন্দী ভ্রমর করে গুঞ্জন পদ্মের অন্তরে,
যবে প্রিয়ার অধর পান করিতাম, শীৎকার দিতো সুখে,
শতদল দেখে তার মুখখানি বার বার মনে পড়ে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর প্রথম অঙ্ক। কাশ্যপের তপোবনে রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে দেখে আপন মনে বল্ছেন—

ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুস্ তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি ॥ ৪৮ ॥

শকুন্তলার বরদেহখানি নিসর্গ-সুন্দর,
সে কোমল দেহ তপের যোগ্য চাহে যেগো করিবারে,
নীলোৎপলের কোমল পাঁপড়ি অপরূপ মনোহর,
তা দিয়ে সে মুনি শমীবৃক্ষের শাখা চায় কাটিবারে।

বল্কল-পরিহিতা শকুন্তলাকে নেপথ্য থেকে দেখে রাজা দুষ্মন্ত বল্ছেন—

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ ॥ ৫২ ॥

শৈবাল দিয়ে ঘেরা থাকিলেও শতদল সুন্দর,
চাঁদে কলঙ্ক থাকিলেও চাঁদ অপরূপ শোভা ধরে,
তেমতি তন্বী শকুন্তলা বল্কলে মনোহর,
সুন্দর যে, সকলি তাহার ভূষণ রচনা করে।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এর তৃতীয় সর্গে দুষ্মন্ত বলছেন শকুন্তলাকে—
কিং শীতলৈঃ ক্লমবিনোদিভিরার্দ্রবাতন্
সঞ্চারযামি নলিনীদলতালবৃন্তৈঃ।
অঙ্কে নিধায় করভোরু যথা সুখং তে
সংবাহয়ামি চরণাবুত পদ্মতাম্রৌ ॥ ৬৬ ॥

শ্রান্তিহরণ পদ্মপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া করি
করিব কি দূর শ্রান্তি তোমার পরম সোহাগ ভরে,
চরণদুখানি পদ্মের মতো রাঙা তব, সুন্দরি,
টিপে দেবো কিগো কোমল চরণ থুয়ে অঙ্কের পরে!

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর ষষ্ঠ অঙ্ক। বিরহ-কাতর রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার একটি আলেখ্য রচনা করেছেন। সেই ছবিটি বয়স্য বিদূষককে দেখাচ্ছেন তিনি, এমন সময় একটি ভ্রমর এসে বার বার চিত্রার্পিতা শকুন্তলার মুখের উপর বসছে। রাজা দুষ্মন্ত ভ্রমরকে সম্বোধন করে বলছেন—
অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ং পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু।
বিম্বাধরং স্পৃশসি চেদ্ ভ্রমর প্রিয়ায়াঃত্বাং কারয়ামি কমলোদরবন্ধস্থম্ ॥ ১০৬ ॥

তরুণ তরুর নব কিশলয় সম চির-অম্লান,
পরশ-না-জানা প্রিয়ার অধর লোভনীয় রূপে রাজে,
রতি-উৎসবে অতি সাবধানে করেছি অধর পান,
যদি ছোঁও তারে হে অলি বন্দী করিব কমল-মাঝে।

দেব-সারথি মাতলি রাজা দুষ্মন্তকে নিয়ে প্রজাপতি মারীচের তপোবনে প্রবেশ করলেন। সেই তপোবনের অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে দুষ্মন্ত মুগ্ধ। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এর সপ্তম সর্গে এই মনোহর শ্লোকটি আছে—
প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচিতা সৎকল্পবৃক্ষে বনে
তোয়ে কাঞ্চনপদ্মরেণুকপিশে পুণ্যাভিষেকক্রিয়া।
ধ্যানং রত্নশিলাতলেষু বিবুধস্ত্রীসন্নিধৌ সংযমো
যৎ কাংক্ষন্তি তপোভিরন্যমুনয়স্তস্মিংস্তপস্যন্ত্যমী ॥ ২১ ॥

কল্পতরুর কাননে থেকেও বায়ু খেয়ে রাখে প্রাণ,
স্বর্ণপদ্মরেণুপিঙ্গল জলে তারা স্নান করে,
অপ্সরা-মাঝে সংযত তারা মণিশিলাপরে বসে করে নিতি ধ্যান
যে লাগি অন্য মুনিদের তপ তারি মাঝে থেকে এ মুনিরা তপ করে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর সপ্তম অংক। বালক সর্বদমন সিংহ-শিশুকে জোর করে তার মাতৃ-স্তন্য থেকে সরিয়ে এনে খেলার সাথী করতে ব্যস্ত। এক তাপসী সর্বদমনকে বল্লেন—সিংহ-শিশুকে ছেড়ে দাও, আমি অন্য খেলনা দেবো তোমাকে। আগে দাও, বলে বালক হাত বাড়ালো। রাজা দুষ্মন্ত সর্বদমনের হাত দেখে বল্লেন—এর হাতে তো রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ রয়েছে।

প্রলোভ্যবস্তুপ্রণয়প্রসারিতো বিভাতি জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ করঃ।
অলক্ষ্যপত্রান্তরমিদ্ধরাগয়া নবোষসা ভিন্নমিবৈক পঙ্কজম্॥ ৪৬॥

খেলনার তরে এ বালক যবে বাড়াইল তার হাত
ঘন-আশ্লিষ্ট অঙ্গুলিগুলি ধরিল তেমতি শোভা,
অতি-প্রত্যুষে নব-অরুণের রক্তিম আলো-মাখা
ফোটো-ফোটো শতদলের যে শোভা, তারি মত মনোলোভা।

রঘুবংশম্-এর প্রথম অংকে নৃপতি দিলীপ ও রাণী সুদক্ষিণার কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে যাওয়ার বর্ণনা আছে। তখন পথে

সরসীষুরবিন্দানাং বীচিবিক্ষোভশীতলম্।
আমোদমুপজিঘ্রান্তৌ স্বনিশ্বাসানুকারিণম্॥ ৪৩॥

সায়রগুলিতে ছোট ছোট ঢেউ তোলে মৃদু সমীরণ,
ঢেউয়ের পরশে শীতল হইল সায়রের শতদল,
পদ্মের ঘ্রাণ নিলেন দু'জনে অতি প্রফুল্লমন,
আপন নিশাস সম সুগন্ধ মনে হোলো পরিমল।

মাতৃত্বের সম্ভাবনা ঘটায় রাণী সুদক্ষিণার রূপের যে পরিবর্তন ঘটেছে সেই পরিবর্তনের ছবি এঁকেছেন কালিদাস রঘুবংশম্-এর তৃতীয় অংকে।

দিনেসু গচ্ছৎসু নিতান্তপীবরং তদীয়মানীলমুখং স্তনদ্বয়ম্।
তিরশ্চকার ভ্রমরাভিলীনয়োঃ সুজাতয়োঃ পঙ্কজকোশয়োঃ শ্রিয়ম্॥ ৮॥

কিছু দিন গেলো, পীনস্তনদুটি হোলো তাঁর স্থূলতর,
সুনীল বরণে রঞ্জিত হোলো স্তনমুখদুটি তাঁর,
যে মোহন শোভা যবে অলি বসে বিকচপদ্মপর,
সুদক্ষিণার স্তনদুটি পেলো সে শোভা চমৎকার।

বৃদ্ধ রাজা দিলীপকে ত্যাগ করে রাজলক্ষ্মী তরুণকুমার রঘুকে আশ্রয় করলেন ঃ—

নরেন্দ্রমূলায়তনাদনন্তরং তদাস্পদং শ্রীর্যুবরাজসংজ্ঞিতম্।
অগচ্ছদংশেন গুণাভিলাষিণী নবাবতারং কমলাদিবোৎপলম্॥ ৩৬॥

মলিন পদ্মে ত্যাগ করি যথা শ্যামলী বনশ্রী
আশ্রয় নেয় নব-প্রস্ফুট তরুণ পদ্মদলে,
তেমতি ত্যজিয়া প্রবীণ নৃপরে মুগ্ধা রাজশ্রী
আশ্রয় নিল তরুণ কুমার রঘু কাছে কুতূহলে।

রাজা দিলীপ রঘুকে সিংহাসনে বসিয়ে রাণী সুদক্ষিণাকে নিয়ে বানপ্রস্থে চলে গেলেন। অভিষেকের পর রঘুর শোভা দেখে মনে হোলো স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁর রাজছত্রধারিণী। রঘুবংশম্-এর চতুর্থ অঙ্কে কবি বল্ছেন—

ছায়ামণ্ডললক্ষ্যেণ তমদৃশা কিল স্বয়ম্।
পদ্মা পদ্মাতপত্রেণ ভেজে সাম্রাজ্য-দীক্ষিতম্॥ ৫॥

স্বয়ং লক্ষ্মী অলক্ষ্যে থাকি ধরেছিল প্রীতিভরে,
শ্বেত পদ্মের রাজছত্রটি রঘুর মাথার পরে।

রঘু দিগ্‌বিজয়ে বেড়িয়েছেন। নানান নৃপতিদের পরাজিত করে রঘু পারস্য দেশের নৃপতিদের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন। তখন যবনদের পরাজয়ে সুন্দরী যবন-রমণীদের আনন্দোজ্জ্বল মুখগুলি মলিন হোলো।

যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।
বালাতাপমিবাব্জানাম কাল জলদোদয়ঃ॥৬১॥

বর্ষার শেষে অসময়ে যবে দেখা দেয় মেঘদল,
সহেনা মেঘেরা ঊষার কিরণে উজল পদ্ম-ছবি,

তেমতি নৃপতি সহিতে নারিল মদরাগ-উজ্জ্বল,
যবন-রমণীকুলের উজল বদন-কমল-ছবি।

নৃপতি রঘুর প্রতাপ দিগন্তবিস্তৃত হোলো, অসহ তার প্রখরতা।
লব্ধপ্রশমনস্বস্থমথৈনং সমুপস্থিতা।
পার্থিবশ্রী র্দ্বিতীয়েব শরৎ পঙ্কজলক্ষণা॥ ১৪॥

শরৎ-আকাশে বর্ষণ-হারা শুভ্র মেঘের দল,
বারিহীন মেঘ তাই তপনের বাধাহীন তাপ-জ্বালা,
নৃপতি রঘুর প্রতাপ তেমতি দুঃসহ প্রোজ্জ্বল,
দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হইল প্রতাপ আগুন-ঢালা।

রঘুবংশম্-এর পঞ্চম অঙ্কে এই বর্ণনা রয়েছে।

অজ ঘুমিয়ে রয়েছেন। তাঁকে জাগাবার জন্যে তাঁর সমবয়স্ক বৈতালিকগণ অজকে বল্লেন—

তদ্বল্গুনা যুগপদুন্মিষিতেন তাবৎ সদ্যঃ পরস্পরতুলামধিরোহিতাং দ্বে।
প্রস্পন্দমান পরুষেতরতারমন্তশ্চক্ষুস্তব প্রচলিত পদ্মম্॥ ৬৮॥

অরুণ কিরণ-পরশ-স্ফুট কমল ও তোমার আঁখি,
তোমার আঁখির তুলনা জোগায় বিকচ পদ্মকলি।
নয়ন মেলিলে চঞ্চল হবে আঁখির কৃষ্ণ তারা,
ফোটো-ফোটো শতদলের মাঝারে চঞ্চল যথা অলি।

রঘুবংশম্-এর ষষ্ঠ সর্গে রাজকুমারী ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের মনোহর বর্ণনা করেছেন কালিদাস। দেশদেশান্তরের রাজারা এসেছেন। ইন্দুমতীর মনোহরণের জন্যে কত তাদের বিলাস বিভ্রম, কতো ছলাকলা! একজন রাজা—

কশ্চিৎ করাভ্যামুপগঢ়নালমালোল পত্রাভিহতদ্বিরেফম্।
রজোভিরন্তঃপরিবেষবন্ধি লীলারবিন্দং ভ্রময়াঞ্চকার॥ ১৩॥

ঘুরায় হাতের লীলা-শতদল চপল পাঁপড়ি দিয়ে,
নৃপতি সে এক তাড়ায় ভ্রমরদলে,
চক্র আকারে ঘুরে মরে তবে কোমল কেশর-রেণু
লীলা-চঞ্চল পদ্মের বুকতলে।

কোনো রাজা আবার—

কুশেশয়াতাম্রতলেন কশ্চিৎ করেণ রেখাধ্বজলাঞ্ছনেন।
রত্নাঙ্গুলীয়প্রভয়ানুবিদ্ধানুদীরয়ামাস সলীলমক্ষান্॥ ১৮॥

পদ্মের মত রাঙা করতলে পতাকার রেখা আঁকা,
অক্ষ খেলিছে এক রাজা লীলাভরে,
রতন-খচিত অঙ্গুরী হাতে তার আভা-অবলিপ্ত,
শুভ্র অক্ষ ওঠে ঝল্মল্ করে।

সখি সুনন্দা প্রত্যেক নৃপতির সম্মুখে ইন্দুমতীকে নিয়ে গিয়ে রাজার পরিচয় দিয়ে দিচ্ছেন।

ইন্দুমতী 'ঋজুপ্রণামক্রিয়য়া' অর্থাৎ নীরস প্রণামের দ্বারা একের পর এক রাজাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে যাচ্ছেন—

তাং সৈব বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা রাজান্তরং রাজসুতাং নিনায়।
সমীরণোত্থেবতরঙ্গলেখা পদ্মান্তরং মানসরাজহংসীম॥ ২৬॥

বেত্রধারিণী সুনন্দা তবে ইন্দুমতীরে লয়ে
যেথা আছে বসে অন্য নৃপতি সেথা চলি গেল ধীরে,
যেমন মানস-সরোবর-বুকে বায়ু যবে ঢেউ তোলে,
পদ্ম হইতে পদ্মে ঊর্মি নেয় রাজহংসীরে।

সুনন্দা মহাপরাক্রমশালী অবন্তী রাজ্যের অধিপতির সামনে ইন্দুমতীকে নিয়ে গিয়ে তাঁর শৌর্যের ও বীর্যের কতো না প্রশংসা করলেন! কিন্তু—

তস্মিন্নভিদ্যোতিতবন্ধুপদ্মে প্রতাপসংশোষিতশত্রুপঙ্কে।
ববন্ধ সা নোত্তমসৌকুমার্য্যা কুমুদ্বতী ভানুমতীব ভাবম্॥ ৩৬॥

পঙ্কের সম শত্রুর দলে দলিয়া যে নৃপ নিতি
করে বিকশিত কমলের মত আপন বন্ধু সবে,
কুমারীর প্রাণে তার প্রতি নাহি উপজিল অনুরাগ,
প্রখরসূর্যকিরণে কুমুদ বিকশিত হয় কবে!

অনূপ দেশের রাজা প্রতীপ। সমর-ক্ষেত্রে ইনি প্রদীপ্ত হুতাশনের মতো। পরশুরামের কুঠার-এর কাছে কমল-দলের মত কোমল।

আয়োধনে কৃষ্ণগতিং সহায়মবাপ্য যঃ ক্ষত্রিয়কালরাত্রিম্।
ধারাং শিতাং রামপরশ্বধস্য সম্ভাবয়ত্যুৎপলপত্রসারাম্॥ ৪২॥

সমরে এ রাজা লভিয়াছিলেন অগ্নির সহায়তা
পরশুরামের তীক্ষ্ম কুঠার ক্ষত্রিয়কুলনাশী,
পদ্মপত্রসম সুকোমল করেছিলো তারে জ্ঞান,
পরশুরামের শোণিত-পিয়াসী কুঠারেরে উপহাসি।

এমন যে মহাবীর ও নয়নরঞ্জন নৃপতি, তিনিও কিন্তু ইন্দুমতীর হৃদয় হরণ করতে পারলেন না।

তস্যাঃ প্রকামং প্রিয়দর্শনোঽপি ন স ক্ষিতীশো রুচয়ে বভূব।
শরৎপ্রমৃষ্টাম্বুধরোপরোধঃ শশীব পর্য্যাপ্ত-কলো নলিন্যাঃ॥ ৪৪॥

মেঘ-জাল হোতে মুক্ত হলেও শরতের পূর্ণিমা
তপন-পিয়াসী পদ্মের মন কভু কি হরিতে পারে?
তেমনি নৃপতি প্রতীপ যদিও প্রিয়দর্শন অতি
তবুও নারিল ইন্দুমতীর হিয়াখানি জিনিবারে।

বেত্রধারিণী সুনন্দা পাণ্ডুদেশাধিপতির সামনে ইন্দুমতীকে নিয়ে গেলেন। এই নৃপতি যেমন সুন্দর তেমনি বীর্যশালী। তাঁর রাজ্য মলয়স্থলী তমালপাত্র তরুতে ভরা। তাদের সুনীল চন্দ্রাতপের তলায় প্রিয়-মিলনের যোগ্য স্থান—এমনি করে কতো বোঝালেন সুনন্দা ইন্দুমতীকে।

ইন্দীবরশ্যামতনুর্নৃপোঽসৌ ত্বং রোচনাগৌরশরীরযষ্ঠিঃ।
অন্যোন্যশোভা-পরিবৃদ্ধয়ে বাং যোগস্তড়িত্তোয়দয়োরিবাস্তু॥ ৬৫॥

নীলপদ্মের মত সুন্দর নৃপতির দেহখানি
তব দেহ-লতা গৌরবরণ, গোরোচনা-অবলিপ্ত,
বিদ্যুৎ ও মেঘ সম দুইজনে দুজনার দেহ-শোভা,
বর্দ্ধিত করো, উজ্জ্বল করো, হউক নয়ন তৃপ্ত।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না। সুনন্দার এই বাক-নৈপুণ্য, এই বর্ণনা-কুশলতা সব ব্যর্থ গেলো।

স্বসুর্বিদর্ভাধিপতেস্তদীয়ো লেভেঽন্তরং চেতসি নোপদেশঃ।
দিবাকরাদর্শনবদ্ধকোশে নক্ষত্রনাথাংশুরিবারবিন্দে॥ ৬৬॥

যবে সন্ধ্যায় ডুবে যায় রবি তখন মুদিত-কলি
পদ্মের বুকে চন্দ্র-কিরণ-সুধা পশেনাকো কভু,
তেমতি যতো না দিলো উপদেশ সুনন্দা কুমারীরে,
বিদর্ভরাজ-অনুজার মনে স্থান পেলো নাকো তবু।

রাজকুমারী ইন্দুমতী রাজকুমার অজের গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিলেন। মনে হোলো সেটা বরমাল্য নয়, যেন ইন্দুমতী তাঁর কোমল বাহুবল্লরী দিয়ে অজের কণ্ঠদেশ বিজড়িত করলেন। তখন সেই স্বয়ংবরসভার অবস্থাটি কি রকম হোলো?

প্রমুদিত বরপক্ষমেকতস্তৎ ক্ষিতিপতিমণ্ডলমন্যতো বিতানম্।
উষসি সর ইব প্রফুল্ল-পদ্মং কুমুদবনপ্রতিপন্ন-নিদ্রমাসীৎ॥ ৮৬॥

প্রফুল্ল বরপক্ষীয় দল সভার একটি ধারে,
অন্যদিকেতে নীরসবদন নৃপতিরা দলে দলে,
যেন প্রভাতের সায়র, পদ্ম বিকশিত এক দিকে,
ওধারে কুমুদ সুপ্তি-মগন শোভে সায়রের জলে।

বিবাহ সভায় হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হোলো। বৈশ্বানরকে সাক্ষী করে পুরোহিত ইন্দুমতীর ও অজের মিলন সম্পন্ন করলেন। সেই হোমাগ্নির ধোঁয়ায় ইন্দুমতীর মুখখানি আচ্ছন্ন হোলো। তখন যে মধুর ছবিটি হোলো তার বর্ণনা কালিদাস রঘুবংশম্-এর সপ্তম্ সর্গে করেছেন।

হবিঃ শমীপল্লবলাজগন্ধী পুণ্যঃ কৃশানোরুদিয়ায় ধূমঃ।
কপোলসংসর্পিশিখঃ স তস্যা মুহূর্ত্ত কর্ণোৎপলতাং প্রপেদে॥ ২৬॥

অগ্নি হইতে উত্থিত হোলো অতি পবিত্র ধূম,
শমীপল্লবঘৃতলাজাদির ধূম সুগন্ধপ্রাণ,
সেই ধূম যবে ঢাকিয়া ফেলিলো বধূর কপোলদুটি
মনে হোল ধূম কর্ণাভরণ কমলের নিল স্থান।

বিবাহ সমাপ্ত হোলো। নৃপতিরা এতক্ষণ অন্তরের ক্রোধ ও বিদ্বেষ চেপে রেখেছিলেন। অজ যখন ইন্দুমতীতে নিয়ে তাঁর রাজ্যের দিকে চল্‌লেন, তখন রাজারা তাঁকে আক্রমণ করলেন পথমাঝে। অজ প্রস্বাপন নামক দিব্য অস্ত্র শত্রুদের উপর নিক্ষেপ করলেন। তার ফলে শত্রুরা নিদ্রায় অভিভুত হয়ে পড়লেন।

শঙ্খস্বনাভিজ্ঞতয়া নিবৃত্তাস্তং সন্নশত্রুং দদৃশুঃ স্বযোধাঃ।
নিমীলিতানামিব পঙ্কজানাং মধ্যে স্ফুরন্তং প্রতিমা-শশাঙ্কম্ ॥ ৬৪ ॥

কুমার অজের চিরপরিচিত শঙ্খের ধ্বনি বাজে,
সে ধ্বনি শুনিয়া ফিরিয়া আসিল তাঁহার সৈন্যদল,
অচেতন সব অরাতির মাঝে হেরিল কুমার রাজে,
মুদিত পদ্মে বিম্বিত যেন শশিকলা উজ্জ্বল।

দিব্যমালিকা নারদের বীণা-যন্ত্রের শীর্ষদেশে সংলগ্ন ছিলো। বেগবান বায়ুতে সেই মালা বীণা-চ্যুত হয়ে আকাশ থেকে উড়ে এসে পড়লো ইন্দুমতীর বক্ষের পরে। ইন্দুমতী গতপ্রাণ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। নৃপতি অজ শত চেষ্টাতেও তাঁর চৈতন্য সম্পাদন করতে পারলেন না। তিনি বিলাপ করতে লাগলেন—এতো কোমল মালিকাও প্রিয়ার প্রাণ হরণ করলো! রঘুবংশম্-এর অষ্টম্ সর্গে এই শ্লোক সন্নিহিত।

অথবা মৃদু বস্তু হিংসিতুং মৃদুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ।
হিমসেকবিপত্তিরত্র মে নলিনী পূর্ব্ব-নিদর্শনং মতা॥ ৪৫ ॥

জগৎ-অন্তকারী মহাকাল অনায়াসে অবহেলে
কোমল বস্তু দিয়ে নাশ করে কোমল বস্তু সবে,
যেমন কোমল শিশির-বিন্দু সোহাগের লীলা খেলে,
শতদলে নাশ করে থাকে নিতি পেলবতা-বৈভবে।

ইন্দুমতীর বিরহ-কাতর নৃপতি অজ গঙ্গা এবং সরযূর পবিত্র সঙ্গম-সম্ভূত তীর্থস্থলে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করলেন। অজ-পুত্র দশরথ সিংহাসন আরোহণ করে দক্ষতার সঙ্গে উত্তর কোসল রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। সমস্ত পৃথিবী তিনি জয় করলেন। রঘুবংশম্-এর নবম সর্গে দশরথের অমিতবিক্রমের বর্ণনা করেছেন কালিদাস।

শমিতপক্ষবলঃ শতকোটিনা শিখরিণাং কুলিশেন পুরন্দরঃ।
স শর-বৃষ্টিমুচা ধনুষা দ্বিষাং স্বনবতা নবতামরসাননঃ॥ ১২॥

দেবরাজ যথা শতকোটিময় কঠোর বজ্রাঘাতে
পর্বতদের পক্ষ ছেদিয়া করিলেন নির্বল,
তেমতি ফুল্ল শতদল সম সুন্দর দশরথ
শরবর্ষণী শরাসন দিয়ে নাশিতেন অরি-বল।

একদিন নব নব কুসুম-সম্ভার নিয়ে বসন্ত এলো মহারাজ দশরথের মনোরঞ্জন করবার জন্যে। ফুল এলো, নব কিশলয় এলো, কোকিলের কুহুরবে ও ভ্রমরগুঞ্জনে বনস্থলী মুখরিত হোলো। তখন ভ্রমর ও জলচর পাখীরা পেলো পদ্মকে বসন্তের উপহার স্বরূপ।

নয়গুণোপচিতামিব ভূপতেঃ সদুপকারফলাং শ্রিয়মর্থিনঃ।
অভিযযুঃ সরসো মধু-সম্ভৃতাং কমলিনীমলিনীরপতত্রিণঃ॥ ২৭॥

যথা ন্যায়বান পরহিতকারী দশরথ নৃপতির
অন্তবিহীন ধনরাশি সব প্রার্থীরা পেয়ে থাকে,
তেমতি হংস জলচর পাখী সারস ভ্রমর দল,
পেলো শতদলে, বসন্ত ঋতু যার বুকে ছোঁওয়া রাখে।

বসন্তকালে গৃহদীর্ঘিকার শোভাও কি কম মনোহর!

শুশুভিরে স্মিতচারুতরাননাঃ স্ত্রিয় ইব শ্লথশিঞ্জিতমেখলাঃ।
বিকচ তামরসা গৃহদীর্ঘিকা মদকলোদকলোল-বিহঙ্গমাঃ॥ ৩৭॥

ভবন-সায়রে ফুটিয়া উঠিল অজস্র শতদল,
জলচরপাপী নানা ধ্বনি করি বিহরে সায়র-জলে,
মেখলা-শোভিতা হাস্যবদনা সুন্দরী নারী সম
শোভা পেলো দীঘি বসন্ত দিনে শীত অবসান হলে।

মহারাজ দশরথ মৃগয়া করবার জন্যে রাজধানী থেকে বহির্গত হলেন। তিনি দ্রুতগামী-রথে চড়ে রুরুমৃগের বাসভূমিতে পৌঁছিলেন গিয়ে। একদল হরিণ দশরথের সামনে এসে হাজির হোলো। তখন—

তৎ প্রার্থিতং জবনবাজিগতেন রাজ্ঞা তূণীমুখোদ্ধৃতশরেণ বিশীর্ণপঙ্‌ক্তিঃ।
শ্যামীচকার বনমাকুলদৃষ্টিপাতৈর্বাতেরিতোৎপলদলপ্রকরৈরিবার্দ্রৈঃ॥ ৫৬॥

দ্রুতগামী রথে আরোহণ করি দশরথ মহাবল,
তূণ হতে শর লয়ে মৃগদের কাছে আসে ত্বরা করে,
দল ভেঙে ভয়ে ধায় হরিণেরা, শ্যামলিল বনতল,
বায়ু-চঞ্চল সিক্তকমল শোভা মৃগ-আঁখি ধরে।

রাক্ষসরাজ দশানন কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়ে দেবতারা ক্ষীরোদসমুদ্রশায়ী বিষ্ণুর

শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণুর তখন যোগনিদ্রার অবসান হোলো। বিষ্ণুর কি রূপ তখন দেবতাদের চোখে পড়লো তার বর্ণনা রঘুবংশম্-এর দশম সর্গে আছে—

শ্রিয়ঃ পদ্মনিষণ্ণায়াঃ ক্ষৌমান্তরিতমেখলে।
অঙ্কে নিক্ষিপ্ত চরণমাস্তীর্ণকরপল্লবে॥ ৮॥

চরণপ্রান্তে কমলে আসীনা কমলা করেন স্তব,
কটির মেখলা ঢাকিয়া ক্ষৌমবস্ত্র পড়েছে লুটি,
কোলের উপর রেখেছেন পাতি দুটি করপল্লব,
হাতদুটি পরে শোভিছে অমল বিষ্ণুচরণদুটি।

দেবতাদের স্তব অন্তে বিষ্ণু বল্লেন ঃ আমি জানি তোমরা দশাননের অত্যাচারে নিপীড়িত। ভয় নেই, শীঘ্রই সে নিহত হবে।

সোঽহং দাশরথির্ভূত্বা রণভূমের্বলিক্ষমম্।
করিষ্যামি শরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তচ্ছিরঃকমলোচ্চয়ম্॥ ৪৪॥

দশরথ-সুত রূপ ধরি হবো ধরাতলে অবতীর্ণ,
রাবণ-মুণ্ডগুলি নিপাতিব তীক্ষ্ণ শরের ঘাতে,
মুণ্ড-কমলমালিকা রচিব লয়ে শিরগুলি ছিন্ন,
রণভূমি করে নিবেদিব মালা বলিরূপে সেই প্রাতে।

রামের জন্ম হোলো। তখন জননী কৌশল্যার চেহারা কি রকম হোলো?

শয্যাগতেন রামেণ মাতা শাতোদরী বভৌ।
সৈকতাম্ভোজবলিনা জাহ্নবীব শরৎকৃশা॥ ৬৯॥

তীরভূমি পরে পূজার জন্যে ছড়ানো কমলদলে
শরৎকালের শীর্ণ গঙ্গা যে মোহন শোভা ধরে,
নবজাত রামে লইয়া শীর্ণা জননী শয্যাতলে
শারদ-গঙ্গা, তীরে শতদল ছবি সম মন হরে।

লঙ্কা থেকে ফিরছেন রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে পুষ্পক-রথে। আকাশ থেকে পরিচিত সব স্থান রাম সীতাকে দেখাচ্ছেন। রঘুবংশম্-এর ত্রয়োদশ সর্গে তার অপূর্ব বর্ণনাগুলি আছে। কোথাও ফেনপুঞ্জশোভিত সমুদ্র, কোথাও সমুদ্রবক্ষে

নত মেঘগুলি। কোথাও জনস্থান, কোথাও বা মাল্যবান পর্বত, পম্পা সরোবর, চিত্রকূট পর্বত যার পাদদেশে মন্দাকিনী নদী একগাছি হারের মতো শোভমানা। এই পর্বতের পাদদেশে মহর্ষি অত্রির তপোবন। মহর্ষি-পত্নী অনুসূয়ার কি তপপ্রভাব।

অত্রাভিষেকায় তপোধনানাং সপ্তর্ষিহস্তোদ্ধৃতহেমপদ্মাম্‌।
প্রবর্ত্তয়ামাস কিলানুসূয়া ত্রিস্রোতসং ত্র্যম্বক মৌলিমালাম্‌॥ ৫১॥

যার জল হতে স্বর্ণকমল তোলেন সপ্ত ঋষি,
শিবের মৌলিপরে মালা সম বিরাজে যে ভাগীরথী,
তপোধনদের অভিষেক তরে গঙ্গারে দিবানিশি
বহায়েছিলেন তপোবনপাশে অনুসূয়া তেজবতী।

গঙ্গার শুভ্রধারার সঙ্গে যমুনার নীল ধারা মিশে কি অনুপম শোভা ধরেছে!

ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈর্মুক্তাময়ী যষ্ঠিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্রমালা সিতপঙ্কজানামিন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেবা॥ ৫৪॥

মনে হয় যেন শুভ্রমুক্তমালিকার মাঝে মাঝে
গাঁথা হইয়াছে ইন্দ্রনীলমণি অতি মনোহর,
কোথাও বা যেন শ্বেত পদ্মের মালিকার মাঝে রাজে
নীল শতদল অপরূপ সুন্দর।

রাম সীতাকে বলছেন—এই সেই সরযূ নদী যার উৎপত্তিস্থল হোলো মানস সরোবর। সেই মানস সরোবরের বর্ণনা আর কি করবো?

পয়োধরৈঃ পুণ্যজনাঙ্গনানাং নির্বিষ্টহেমাম্বুজরেণু যস্যাঃ।
ব্রাহ্মংসরঃ কারণমাপ্তবাচো বুদ্ধেরিবাব্যক্তমুদাহরন্তি॥ ৬০॥

এই সরযূর মহত্ব-হেতু মানস সরসী জেনো,
মানস হইতে নদীর জন্ম মুনিগণ-কীর্তিত,
যক্ষবধূরা স্নান করে জলে, স্বর্ণকমল ফোটে,
বধূদের স্তন স্বর্ণকমল-রজে হয় রঞ্জিত।

রঘুবংশম্‌-এর পঞ্চদশ সর্গ। ভ্রমণরত রাম দেখলেন একজন লোক তপস্যারত। জিজ্ঞেস করে জানলেন রাম যে সে জাতে শূদ্র, নাম তার শম্বুক। ইন্দ্রত্ব লাভের দুষ্কর

তপস্যায় সে রত। শূদ্রের অধিকার নেই এই তপস্যা করবার, এই বিচার করে তাকে বধ করবার জন্যে রাম অস্ত্র ধরলেন।

স তদ্বক্ত্রং হিমক্লিষ্টকিঞ্জল্কমিব পঙ্কজম্ ।
জ্যোতিষ্কণাহতশ্মশ্রু কণ্ঠনালাদপাতয়েৎ ॥ ৫২ ॥

অগ্নিদগ্ধশ্মশ্রু শূদ্র শম্বুক তপরত
তুষারপাতেতে ম্লান শতদল সম মুখখানি রাজে,
অস্ত্র আঘাতে পাণ্ডু আনন কণ্ঠের নাল হতে
ছিন্ন করিল দাশরথি, শির পড়িল ভূতল মাঝে।

রঘুবংশম্-এর ষোড়শ সর্গ। মহারাজ কুশ ইন্দ্রের মত তেজস্বী। গভীর রজনীতে তাঁর শয়নকক্ষে এক ললনা 'জয়হোক মহারাজ' বলে যুক্তকরে দাঁড়ালেন। বিস্মিত কুশ বললেন 'কে তুমি? কি করে বন্ধ-অর্গল ঘরে এলে?

লব্ধান্তরা সাবরণেঽপি গেহে যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে ।
বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্ ॥ ৭ ॥

অর্গল-দেওয়া গৃহমাঝে তুমি প্রবেশিতো পারো নারী
এমন যোগের প্রভাব তোমাতে হয় না তো লক্ষিত,
শিশির-মথিতা পদ্মিনী যথা বিবর্ণ মুখ তারি,
তেমতি তোমার বিষণ্ণ মুখ বেদনায় ভরে চিত।

ইক্ষ্বাকু-রাজ-লক্ষ্মী মহারাজ কুশকে বলছেন যে কি দুর্দশা তাঁর রাজ্যের ঘটেছে।

চিত্রদ্বিপাঃ পদ্মবনাবতীর্ণাঃ করেণুভির্দত্তমৃণালভঙ্গাঃ ।
নখাঙ্কুশাঘাতবিভিন্নকুম্ভাঃ সংরব্ধসিংহপ্রহৃতং বহন্তি ॥ ১৬ ॥

প্রাসাদগাত্রে আঁকা মাতঙ্গদল শতদল-বনে,
হস্তিনী সবে প্রেমভরে দেয় পদ্মমৃণাল তুলি,
চিত্রিত সেই মাতঙ্গদলে বাস্তব ভাবি মনে,
নখর আঘাতে ছেঁড়ে আলেখ্য কুপিত সিংহগুলি।

গ্রীষ্মের দিন এসেছে। সেই তাপ-দগ্ধা গ্রীষ্ম দিনে—

দিনে দিনে শৈবলবন্ত্যধস্তাৎ সোপানপর্ব্বাণি বিমুঞ্চদম্ভঃ।
উদ্দণ্ডপদ্মং গৃহদীর্ঘিকাণাং নারীনিতম্বদ্বয়সং বভূব॥ ৪৬॥

দিনে দিনে ক্ষীণ হতে ক্ষীণ হোলো গৃহ-সরোবর-জল,
সোপানের নীচে নেমে গেলো জল, শৈবাল ওঠে ভাসি,
ভাসিয়া উঠিল পদ্ম-মৃণাল হতে সায়রের তল,
নারী-নিতম্ব-প্রমাণ হইল সায়রের জলরাশি।

মহারাজ কুশ গ্রীষ্মকালে সরযূ নদীতে নৌকাবিহার করছিলেন। তাঁর শুদ্ধান্ত-বাসিনী সুন্দরীদের জলকেলি তিনি তন্ময় হয়ে দেখছিলেন আর চামরধারিণী কিরাতীকে দেখাচ্ছিলেন। শেষে না থাকতে পেরে তিনিও জলে নামলেন।

স নৌ-বিমানাদবতীর্য্য রেমে বিলোলহারঃ সহতাভিরপ্সু।
স্কন্ধাবলগ্নোদ্ধৃতপদ্মিণীকঃ করেণুভির্বন্য ইব দ্বিপেন্দ্রঃ॥ ৬৮॥

নৌকা হইতে জলেতে নামিল রাজা কুশ মহাবল,
ঘন ঘন দোলে কণ্ঠের হার চারু কণ্ঠের পরে,
মনে হোল যেন স্কন্ধে ধরিয়া ছিন্নকমলদল
বনমাতঙ্গ করিণীর সাথে মিলিয়াছে প্রেমভরে।

নৃপতি অতিথি অশেষ গুণবান ছিলেন। সূর্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার দূর হয় তেমনি তাঁর দর্শনে প্রজাদের দুঃখ-দৈন্য দূর হোতো। রঘুবংশম্-এর সপ্তদশ সর্গে এই শ্লোক আছে ঃ—

ইন্দোরগতয়ঃ পদ্মে সূর্যস্য কুমুদেঽংশবঃ।
গুণাস্তস্য বিপক্ষেঽপি গুণিনো লেভিরেঽন্তরম্॥ ৭৫॥

চন্দ্রের আলো পশে না কভুও পদ্মের অন্তরে,
সূর্যকিরণ নাহি লভে স্থান কুমুদ ফুলের প্রাণে,
নৃপ অতিথির এমনি আছিল অতুলন গুণরাশি
শত্রুও তাঁর হোতো আকৃষ্ট গুণগরিমার টানে।

রঘুবংশম্-এর অষ্টাদশ সর্গ। মহারাজ অতিথি পুত্র নিষধকে রাজসিংহাসনে

বসিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে স্বর্গে চলে গেলেন। তখন নিষধ সসগেরা পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন।

পৌত্রঃ কুশস্যাপি কুশেশয়াক্ষঃ সসাগরাং সাগরধীরচেতাঃ।
একাতপত্রাং ভুবমেকবীরঃ পুরার্গলাদীর্ঘভুজো বুভোজ॥ ৪॥

সমুদ্র সম অতি প্রশান্ত কমল-নয়ন ধীরে,
নগরতোরণদ্বার অর্গল সম মহাবাহু তিনি,
কুশের পৌত্র নৃপতি নিষধ অপ্রতিরথ বীর,
শাসন করিতে লাগিল পৃথিবী শত্রুর দলে জিনি।

রাজা নিষধের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নল রাজত্ব করতে লাগলেন। যেমন সুন্দর তিনি তেমনি বীর।

তস্যানলৌজাস্তনয়স্তদন্তে বংশশ্রিয়ং প্রাপ নলাভিধানঃ।
যো নড়লানীব গজঃ পরেষাং বলান্যমৃদ্নান্নলিনাভবক্ত্রঃ॥ ৫॥

অনলের সম উজ্জ্বল নল আননে কমল-ছবি,
নিষধ পুত্র নল রাজা হোলো পিতার মৃত্যুপরে,
শত্রুর বল চূর্ণ করিল বীর রাজত্ব লভি,
নল-সমাকুল স্থান মাতংগ যথা মর্দিত করে।

কুমারসম্ভবম্-এর প্রথম সর্গে হিমালয়ের বর্ণনা করেছেন মহাকবি অনেক কটি শ্লোকে। হিমালয় কি যেমন-তেমন উঁচু! সূর্য তার নীচে থাকায়, ঊর্ধ্বমুখীন কিরণ দিয়ে পদ্ম ফোটায় শিখরের সরোবরে।

সপ্তর্ষিহস্তাবচিতাবশেষাণ্যধো বিবস্বান্ পরিবর্ত্তমানঃ।
পদ্মানি যস্যাগ্রসরোরুহাণি প্রবোধয়ত্যূর্ধ্বমুখৈর্ময়ূখৈঃ॥ ১৬॥

গিরির শিখরে সরোবরে ফোটে অযুত পদ্মদল,
সপ্ত ঋষিরা তুলে নিয়ে যান উৎপল পূজা তরে,
ঊর্ধ্বমুখীন রবির কিরণে বিকশিত শতদল,
অধোদেশ হতে রবির কিরণ পড়ে যবে সরোবরে।

গিরিরাজসুতা পার্বতীর কি অপরূপ দেহ-লাবণ্য! যেন সূর্য-কিরণ-সমুজ্জ্বল প্রস্ফুট শতদল।

উন্মীলিতং তুলিকয়েব চিত্রং সূর্যাংশুভির্ভিন্নমিবারবিন্দম্ ।
বভূব তস্যাশ্চতুরস্রশোভি বপুর্বিভক্তং নব-যৌবনেন॥ ৩২॥

নবযৌবনে কিশোরী উমার দেহখানি উজ্জ্বল,
পার্বতী-দেহ তুলিংকাংকিত ছবিসম পেলো শোভা,
মনে হোল যেন সূর্য-কিরণে প্রস্ফুট শতদল,
নিখুঁত-কান্তি হল দেহখানি সকলের মনোলোভা।

উমার চরণদুটি কি সুন্দর! পায়ের বুড়ো আঙ্গুল যখন মাটিতে পড়ে তখন মনে হয় স্থলপদ্মের আভায় মাটি রক্তিম হয়ে উঠেছে।

অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠনখপ্রভাভি নিক্ষেপণাদ্রাগমিবোদ্গিরন্তৌ ।
আজহ্রতুস্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাং স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্॥ ৩৩॥

ঈষৎ তুলিয়া অংগুষ্ঠটি উমা যবে যান চলে
যবে ফের সেই অংগুষ্ঠটি করে ভূমি পরশন,
মনে হয় ঝরে রক্তিম নখ হতে আভা ধরাতলে,
স্থল-পদ্মের মাধুরী ছড়ায়ে যান উমা অনুখন।

উমার মুখখানিতে একই সংগে চন্দ্রের আর পদ্মের সৌন্দর্য।

চন্দ্রং গতা পদ্মগুণান্নভুঙ্‌ক্তে পদ্মাশ্রিতা চান্দ্রমসীমভিখ্যাম্ ।
উমামুখন্তু প্রতিপাদ্য লোলা দ্বিসংশ্রয়াং প্রীতিমবাপ লক্ষ্মীঃ॥ ৪৩॥

শতদলশোভা পান না চপলা যখন থাকেন চন্দ্রের কাছে রাতে,
দিবসে যখন পদ্মের কাছে, চন্দ্রসুধায় হন তবে বঞ্চিত,
চন্দ্র, পদ্ম উভয়ের প্রীতি লভিলেন এক সাথে,
যখন লক্ষ্মী লভিল উমার আনন সুবাঞ্ছিত।

উমার নয়নদুটিতে নীলপদ্মের শোভা।

প্রবাতনীলোৎপলনির্বিশেষমধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা ।
তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যস্ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ॥ ৪৬॥

বায়ু-চঞ্চল নীল-উৎপল সম তাঁর আঁখিদুটি,
আয়ত-নয়না উমার নয়নদুটি সদা চঞ্চল,
এ অপাঁর দিঠি মৃগ হতে উমা নিয়েছিলো কিগো লুটি?
কিম্বা উমার কাছ হতে নিল মুগ্ধ হরিণীদল?

কুমারসম্ভবম্-এর দ্বিতীয় অংক। তারকাসুর স্বর্গের সিংহাসন দখল করেছে। দেবতারা বিতাড়িত। বিপদে পড়ে দেবতারা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার কাছে গেলেন। তাঁদের মুখশ্রী তখন ঘুমন্ত পদ্মের মতো।

তেষামাবিরভূদ্ ব্রহ্মা পরিম্লানমুখশ্রিয়াম্ ।
সরসাং সুপ্তপদ্মানাং প্রাতর্দীধিমানিব॥ ২॥

ম্লানমুখ দেবগণের সমুখে প্রভাতসূর্য সম
এলেন ব্রহ্মা সর্বলোক-আশ্রয় পিতামহ,
মনে হোলো যেন সুপ্তপদ্ম-আকীর্ণ সরোবরে
উদয় হইল প্রভাতসূর্য আলোক-বার্তাবহ।

তারকাসুরের প্রতাপ, তার কি তুলনা আছে? ত্রিভুবন ত্রস্ত তার প্রতাপে। তার ভবন-সায়রের পদ্মগুলিকে ফোটাবার জন্যে সূর্যকেও হুঁশিয়ার থাকতে হয়।

পুরে তাবন্তমেবাস্য তনোতি রবিরাতপম্ ।
দীর্ঘিকাকমলোন্মেষো যাবন্মাত্রেণ সাধ্যতে॥ ৩৩॥

তারকাসুরের প্রাসাদ-মাঝারে ত্রস্ত মরীচিমালী
অতি ভয়ে ভয়ে ততোটুকু দেয় তাপ,
যাহাতে তাহার ভবন-সায়রে সুপ্ত কমলদল
বিকশিত হয়, তাদের পরাণে না রহে মনস্তাপ।

মন্দাকিনীর কি দুর্দশা এই অসুরের জন্যে। স্বর্ণকমল আর ফোটে না তার জলে।

মন্দাকিন্যাঃ পয়ঃ শেষং দিগ্‌বারণ-মদাবিলম্ ।
হেমাম্ভোরুহশস্যানাং তদ্বাপ্যোধাম সাম্প্রতম্॥ ৪৪॥

মন্দাকিণীতে রয়েছে এখন শুধুই অম্ভোরাশি,
দিগ্‌গজদের মদ-কলুষিত আবিল নদীর জল,
স্বর্ণকমল ফুটিতে যা সব তাহা উন্মূল করি
নিয়ে চলে গেছে নিজ দীঘি তরে অসুর সে মহাবল।

রুদ্রদেব যেখানে তপস্যা করছিলেন সেই তপোবনে বসন্ত এলো। মধুতে ভরে গেলো ফুলগুলি, কৃষ্ণসার তার শৃঙ্গের ডগা দিয়ে হরিণীর নয়ন কণ্ডূয়ন করে দিতে লাগলো।

দদৌ রসাৎ পংকজরেণুগন্ধি গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা॥ ৩৭॥

মাতঙ্গ-প্রিয়া দিলো অনুরাগে প্রিয়তম-মুখে তার,
পদ্মপরাগগন্ধে, আমোদ স্বচ্ছ সরসীজল,
পদ্ম-মৃণাল-আহার-তৃপ্ত প্রেমিক চক্রবাক
প্রেয়সীরে দিলো পদ্মমৃণাল সুমধুর সুকোমল।

মদন ভস্ম হলেন শঙ্করের ক্রোধাগ্নিতে। লজ্জিতা উমা যাত্রা করলেন গৃহ-অভিমুখে। প্রিয় দুহিতার বিপদ আশংকা করে হিমালয় তাঁকে দুই হাতে তুলে নিয়ে গৃহপানে ছুটলেন। তখন পার্বতীর শোভা সুরগজের দন্ত-লগ্ন শতদলের শোভার মতন।

সপদি মুকুলিতাক্ষীং রুদ্রসংরম্ভভীত্যা দুহিতরমনুকম্পামদ্রিরা দায় দোর্ভ্যাম্!
সুরগজ ইব বিভ্র পদ্মিণীং দন্তলগ্নাং প্রতিপথগতিরাসীদ্বেগদীর্ঘীকৃতাঙ্গ॥ ৭৬॥

মুকুলিত-আঁখি শিব-রোষ-ভীতা উমারে স্নেহের সাথে
দুই বাহু দিয়ে তুলে নিয়ে ধেয়ে চলিলেন হিমালয়,
সুরগজ যথা দন্তে লগ্ন শতদল লয়ে বেগে
আকাশ-পথেতে পরমানন্দে ছুটে চলে নির্ভয়।

মদন-ভস্মের পর মদন-বধূ রতি মদনের জন্যে বিলাপ করতে লাগলেন। কুমারসম্ভবম্-এর চতুর্থ অঙ্কে জল-শূন্য সায়রের পদ্মের সঙ্গে রতির তুলনা করেছেন কালিদাস।

ক্ব নু মাং ত্বদধীনজীবিতাং বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।
নলিনী ক্ষতসেতুবন্ধনো জলসঙ্ঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ॥ ৬॥

সেতুবন্ধন ভঙ্গ করিয়া জলরাশি চলে গেলে
যে বিষম দশা হয় কমলের জলহীন সরোবরে,
তেমতি তোমার প্রেমাধীনা মোরে তুমি চলে গেলে ফেলে,
কোথা মিলাইলে এতোদিনকার ভালোবাসা ত্যাগ করে?

মদন-প্রিয়া রতি বিলাপ করে বলছেন—আমার কানের শতদলের পরাগে তোমার চক্ষুদুটি অন্ধ হোতো, আজ তুমি কোথায় গেলে।

স্মরসি স্মর! মেখলাগুণৈরুত গোত্রস্খলিতেষু বন্ধনম্ ।
চ্যুতকেশরদূষিতেক্ষণান্যবতংসোৎপলতাড়নানি বা ॥ ৮ ॥

[illegible] ওগো প্রিয় অন্য নারীর নাম নিতে ভুল করে,
মেখলা-বাঁধনে বাঁধিয়া তোমারে শাস্তি দিতাম আমি,
কর্ণভূষণ শতদল দিয়ে তোমারে তাড়না করিতাম প্রেমভরে,
কমল পরাগে ভরিতি নয়ন ওগো হৃদয়ের স্বামী ।

বিফল-মনোরথা পার্বতী যখন তপস্যার জন্যে সাজলেন, তখনো তিনি সুন্দর। পদ্ম যেমন সুন্দর ভ্রমরসংগমে ও শৈবাল বেষ্টনে। কুমারসম্ভবম্-এর পঞ্চম সর্গে কবি বলছেন—

যথা প্রসিদ্ধৈর্মধুরং শিরোরুহৈর্জটাভিরপ্যেবমভূত্তদাননম্ ।
ন ষট্পদশ্রেণিভিরেব পংকজং সশৈবালসংগমপি প্রকাশতে ॥ ৯ ॥

চারু অলকের মাঝে মুখখানি জাগাতো যে অনুরাগে,
তেমতি মধুর উমার আনন দেখাল জটার মাঝে,
কমল শুধুই ভ্রমর-মিলনে সুন্দর নাহি লাগে,
শৈবাল মাঝে শতদল সেও মনোহর হয়ে রাজে ।

পার্বতী যখন তপস্যা করতেন তখন তাঁর মুখখানি প্রখর সূর্যের তাপে লাল হোতো, তখন তাঁর মুখটি প্রস্ফুট পদ্মের মতো শোভা পেতো।

তথাতিতপ্তংসবিতুর্গভস্তিভির্মুখং তদীয়ং কমলশ্রিয়ং দধৌ ।
অপাঙ্গয়োঃ কেবলমস্য দীর্ঘয়োঃ শনৈঃ শনৈঃ শ্যামিকয়া কৃতং পদম্ ॥ ২১ ॥

প্রখর তপন তাপেতে তপ্ত উমার আননখানি
অরুণ কিরণে রঞ্জিত শতদল সম মনোলোভা,
শুধু ধীরে ধীরে নয়নের কোণে ঘন কালো রেখা টানি
ডাগর আঁখির প্রান্তে কালিমা পেল অপরূপ শোভা।

যখন পার্বতী শীতের রাতে আকণ্ঠ জলে নিমগ্ন হয়ে তপস্যা করতেন তখন রাত্রি বেলায় তাঁর মুখখানি পদ্মের মতো জলের উপরে শোভা পেতো।

মুখেন সা পদ্মসুগন্ধিনা নিশি প্রবেপমানাধরপত্রশোভিনা।
তুষারবৃষ্টিক্ষত পদ্মসম্পদাং সরোজসন্ধানমিবাকরোদপাম্॥ ২৭॥

কণ্ঠ অবধি জলে নিমজিয়া সারা হিম-শর্বরী
গিরিনন্দিনী উমা করিতেন ঘোর তপস্যা যবে,
পদ্মপাতার শোভা অধরেতে, পদ্মগন্ধিমুখটি উপরে ধরি,
পদ্ম-বিলীন সায়রে আনন বিকচপদ্ম-শোভা উপজিল তবে।

ব্রাহ্মণবেশী মহাদেব যখন তপরতা উমাকে তাঁর তপস্যার হেতু শুধালেন তখন লজ্জায় অধোমুখী উমা সখিকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে বল্লেন। সখি তখন জানালেন কি কারণে পদ্মের পাঁপড়ি দিয়ে রবির কিরণ আটকানোর মতো উমার এই দুঃসাধ্য সাধনা।

সখী তদীয়া তমুবাচ বর্ণিনং নিবোধ সাধো তব চেৎ কুতূহলম্।
যদর্থমম্ভোজমিবোষ্ণবারণং কৃতং তপঃসাধনমেতয়া বপুঃ॥ ৫২॥

কহিল উমার সহচরী তাঁরে—হে সাধু শ্রবণ করো,
কুতূহল যদি জেগে থাকে মনে কেন এ তপের সাধনা,
কেন পদ্মের দল দিয়ে বৃথা তাপনিবারণ সম
কোমল দেহটি দিয়ে পার্বতী সহেন তপের যাতনা।

কুমারসম্ভবম্-এর ষষ্ঠ সর্গে এই মধুর বর্ণনাটি আছে। অঙ্গিরা ঋষি যখন হিমালয়কে শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহের প্রস্তাব করলেন তখন পার্বতী লজ্জায় অধোমুখে হাতের লীলাকমলের পাঁপড়ি গুণছিলেন।

এবং বাদিনী দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী॥ ৮৪॥

এমত কহিল ঋষি যবে তবে অধোমুখী পার্বতী
পিতার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন নীরব সলাজ মুখে,
লীলাকমলের কোমল পাঁপড়ি পেলব মোহন অতি
গুণিতেছিলেন তার দলগুলি গভীর মনের সুখে।

পার্বতীর বিবাহের দিন এলো। তাঁকে সাজাতে লাগলেন সখিরা। অঙ্গে গোরোচনা দিয়ে পত্রলেখা রচনা করলেন। কোঁকড়া কালো কেশের মধ্যে উমার শুভ্র মুখখানি ভ্রমর-বসা পদ্মের শোভা ধারণ করলো। কুমারসম্ভবম্-এর সপ্তম্ সর্গে তার বর্ণনা করেছেন কবি।

লগ্নদ্বিরেফং পরিভূয় পদ্মং সমেঘরেখং শশিনশ্চ বিম্বম্ ।
তদাননশ্রীরলকৈঃ প্রসিদ্ধৈশ্চিচ্ছেদ সাদৃশ্যকথাপ্রসঙ্গম্ ॥ ১৬ ॥

চারুকেশপাশে ঘেরা মুখখানি কি মোহন শোভা ধরে,
ভ্রমর-লগ্ন পদ্মের শোভা তার কাছে মানে হার,
কালো মেঘ মাঝে চন্দ্রের শোভা হার মানে লাজ ভরে,
এদের তুলনা এ মুখের সাথে : এ বাতুল আশা কার!

কোনো সখি পার্বতীর নীলোৎপলের মতো ঢল ঢল নয়নদুটিতে কাজল পরালেন।

তস্যাঃ সুজাতোৎপলপত্রকান্তে প্রসাধিকাভির্নয়নে নিরীক্ষ্য ।
ন চক্ষুষোঃ কান্তিবিশেষবুদ্ধ্যা কালাঞ্জনং মঙ্গলমিত্যুপাত্তম্ ॥ ২০ ॥

নীল পদ্মের সম মনোহর উমার নয়নে যবে
প্রসাধন তরে কালো কজ্জল দিতে গেলো সহচরী,
কাজল বাড়াবে নয়ন-মাধুরী, একি কভু সম্ভবে!
শুধু মঙ্গল তরে কাজল-পরানো ভাবে সখি সুন্দরী।

এদিকে শিব যখন সেজেগুজে বিবাহের জন্যে যাত্রা করলেন তখন সপ্ত-মাতৃকারাও তাঁর অনুগমন করলেন। তাঁদের মুখগুলি শতদলের মতো শোভা পেলো।

তং মাতরো দেবমনুব্রজন্ত্যঃ স্ববাহনক্ষোভ-চলাবতংসাঃ ।
মুখৈঃ প্রভামণ্ডলরেণুগৌরৈঃ পদ্মাকরং চক্রুরিবান্তরীক্ষম্ ॥ ৩৮ ॥

যাত্রা করিল মহাদেব যবে সাজিয়া বিবাহতরে,
মাতৃকা সপ্ত নিজ নিজ রথে চলিলেন সাথে সাথে,
গৌর আনন উজল প্রভায়, কর্ণভূষণ দোদুল গতির ভরে,
শতদল-ভরা সরসীর শোভা সুনীল আকাশ নিলো সেই শুভপ্রাতে।

ওষধিপ্রস্থনগরে যখন মহাদেব প্রবেশ করলেন তখন তাঁকে দেখবার জন্যে পুরনারীরা ভিড় করে এলেন বাতায়নে। কেউ কাজল পরতে পরতে, কাজল-লতা হাতে বাতায়নে গিয়ে হাজির। কারো চন্দ্রহার গাঁথা শেষ হলো না তাড়াতাড়িতে। মণিগুলি ধুলায় খসে পড়লো। মধুপানবিহ্বলা পুরকামিনীদের মুখগুলি বাতায়ন-পথে কমলের মতো শোভা পেলো।

তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈর্ব্যাপ্তান্তরাঃ সান্দ্রকুতূহলানাম্।
বিলোলনেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ সহস্রপত্রাভরণা ইবাসন্॥ ৬২॥

কুতূহলী পুরনারীদল সবে বাতায়নে বাতায়নে,
ভ্রমরের মতো কালো আঁখিগুলি, মদিরাগন্ধমুখে,
যবে তারা দেখা দিল জানালায় পথপার্শ্বের ভবনে
মনে হোলো যেন সেজেছে কমলে বাতায়নগুলি সুখে।

শিব ও পার্বতীর বিবাহ হয়ে গেলো। তখন লক্ষ্মী এসে শতদল-শোভিত ছত্র ধরলেন নবদম্পতীর মাথার উপর।

পত্রান্তলগ্নৈর্জলবিন্দুজালৈরাকৃষ্টমুক্তাফলজালশোভম্।
তয়োরুপর্য্যায়াত নালদণ্ডমাধত্ত লক্ষ্মীঃ কমলাতপত্রম্॥ ৮৯॥

দম্পতী-শিরোপরে ধরিলেন কমল-ছত্র লক্ষ্মী,
কমলের দলে জল-কণা দোলে মুক্তা-ঝালর সম,
দীর্ঘ পদ্ম-মৃণাল রচিল ছত্র-দণ্ডখানি
অতুলন শোভা ধরিল ছত্র অপূর্ব নিরুপম।

কুমারসম্ভবম্-এর অষ্টম সর্গে হর-পার্বতীর রতি-লীলার এই বর্ণনা আছে। পার্বতীর মুখ পদ্মের মতো সুন্দর। সেই সুন্দর মুখের ফুৎকার দিয়ে পার্বতী

মহাদেবের ললাট-নেত্র থেকে তাঁর কেশ হতে উড়ে-পড়া গন্ধচূর্ণ দূর করতেন।

চুম্বনাদলকচূর্ণদূষিতং শঙ্করোপি নয়নং ললাটজম্ ।
উচ্ছ্বসৎকমলগন্ধয়ে দদৌ পার্ব্বতীবদনগন্ধবাহিনে॥ ১৯॥

শিবের ললাট-নেত্রটি যবে চুমিতেন প্রেমভরে
তখন উমার অলক হইতে ঝরিত গন্ধচূর্ণ,
কমলের মতো চারু-আননের সুবাস-পবন-ভরে
ফুৎকার দিয়ে গন্ধ-ধূলিরে উড়াতেন উমা তূর্ণ ।

পার্বতীর মুখখানি পদ্মের মতো সুন্দর। সেই মুখ-কমলের নিত্য-মধুপ মহাদেব পার্বতীকে নিয়ে মন্দার পর্বতের কটিদেশে কিছুকাল কাটালেন।

পদ্মনাভবলয়াঙ্কিতাশ্মসু প্রাপ্তবৎস্বমৃতবিপ্রুষোনবাঃ ।
মন্দরস্য কটকেষু চবসৎ পার্ব্বতীবদনপদ্মষট্‌পদঃ॥ ২০॥

উমার বদন-কমলের চির-মধুকর শংকর,
অমৃতমথনসময়ে যে গিরি বিষ্ণুবলয়চিহ্ন
লভেছিলো সেই মন্দার গিরি কটিভূমে মনোহর
করিলেন বাস পার্বতীসহ দোঁহে রতি-লীলা-খিন্ন ।

অনভিজ্ঞা উমা ধীরে ধীরে প্রেম-লীলায় নিপুণা হয়েছেন। স্বর্ণকমল দিয়ে শঙ্করকে তাড়না করতেও তিনি শিখেছেন। সেকালে স্বর্ণকমল সম্মার্জনীর কাজ করতো দেখা যাচ্ছে!

হেমতামরসতাড়িত প্রিয়া তৎকরাম্বু বিনিমীলিতেক্ষণা ।
সা ব্যগাহত তরঙ্গিণীমুমা মীনপঙ্‌ক্তি পুনরুক্তমেখলা॥ ২৬॥

স্বর্ণকমল দিয়ে পার্বতী তাড়না যখন করিতেন মহাদেবে,
শঙ্কর তবে ছিটোতেন জল, নিমীলিত হতো উমার নয়নদুটি,
দিশাহারা হয়ে পার্বতী তবে মন্দাকিনীতে পড়িতেন ত্বরা নেবে,
মীনদল সবে রচিত তখন দ্বিতীয় মেখলা তাঁর কটিতটে লুটি ।

উমার সঙ্গে মহাদেব গন্ধমাদন পর্বতের মনোহর বনদেশে প্রবেশ করলেন। সূর্য তখন অস্তাচলে যাচ্ছে। সেই সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে শিব বল্লেন পার্বতীকে—

প্রিয়ে, সূর্য অস্তাচলে যাচ্ছে। যাবার সময়ে তোমার নয়নদুটিতে থুয়ে চলে গেলো পদ্মের সৌন্দর্য।

পদ্মকান্তিমরুণত্রিভাগয়োঃ সংক্রময্য তব নেত্রয়োরিব।
সংক্ষয়ে জগদিব প্রজেশ্বরঃ সংহরত্যহরসাবহর্পতিঃ॥ ৩০॥

রক্তিম তব নয়নদুটিতে সঁপিয়া পদ্মশোভা
চলে যায় রবি দিন-অবসানে অস্ত-অচল-তীরে,
যেমতি ব্রহ্মা প্রলয়ের কালে এ জগৎ মনোলোভা
সংহার করেছিলেন ব্রহ্মা প্রলয়ের কালো নীরে।

মহাদেব পার্বতীকে বল্লেন—দেখ, প্রিয়ে চক্রবাকীকে। কি তাদের প্রেম একটি পদ্মের কেশর যাচ্ছে তারা দুজনে।

দষ্টতামরসকেশরত্যজোঃ ক্রন্দতোর্বিপরিবৃত্তকণ্ঠয়োঃ।
নিঘ্নয়ো সরসি চক্রবাকয়োরল্পমন্তরমনল্পতাং গতম্॥ ৩২॥

চক্রবাকমিথুনের দুখ যবে দিন অবসান,
এক্‌টি পদ্মকেশর দুজনে খাইতে আছিল সুখে,
রজনী আসিল, দুজনার মাঝে বেড়ে গেলো ব্যবধান,
ক্রন্দনরত দুজনে দুদিকে মুখটি ফেরায় দুখে।

বন্যবরাহগুলিও সন্ধ্যা-সমাগমে সায়রের জল থেকে উঠে ছুটে যাচ্ছে বন-ভবনে। তাদের শাদা দাঁতগুলি পদ্মের মৃণালের মতো ঝক্ ঝক্ করছে।

উত্তরন্তি বিনিকীর্য্য পল্বলং গাঢ়পঙ্কমতিবাহিতাতপাঃ।
দংষ্ট্রিণো বনবরাহযূথপা দষ্টভঙ্গুরবিসাঙ্কুরা ইব॥ ৩৫॥

বিপুলদ্রংষ্ট্র বন্যবরাহ প্রগাঢ়-পঙ্ক সায়রের জলে নামি
আলোড়িয়া সরোবর-কর্দম সারাটি দিবস ধরি,
সন্ধ্যা আসিলে ত্যাজি সরোবর ছুটিয়া চলিছে বনতল অভিমুখে,
শুভ্র দংষ্ট্র হেরে মনে হয় পদ্ম-মৃণাল লয়ে ধায় ত্বরা করি।

দিন অবসান হোলো। পদ্মগুলির পাঁপড়ি বন্ধ হয়ে আসছে, তবু ঈষৎ-খোলা ভ্রমরের প্রতীক্ষায়।

বদ্ধকোষমপি তিষ্ঠতি ক্ষণং সাবশেষবিবরং কুশেশয়ম্।
ষট্‌পদায় বসতিং গ্রহীষ্যতে প্রীতিপূর্বমিব দাতুমন্তরম্॥ ৩৯॥

দিন-অবসানে মুদিয়া আসিছে বিকচ পদ্মগুলি,
মুদিয়া আসিছে, তবুও ঈষৎ রাখিয়াছে খোলা বুক,
পরাণ সঁপিতে ভ্রমরেরে রবি রেখেছে পাঁপড়ি খুলি
হের কমলিনী অধীর আশায় অপেখিছে অলি-সুখ।

রাত্রির কালো কেশ কিরণ-অঙ্গুলি দিয়ে আকর্ষণ করে চন্দ্রমা তার মুখ-চুম্বন করছে। নিশার কমল-আঁখি চাঁদের সোহাগে মুদিত হয়ে আসছে।

অঙ্গুলীভিরিব কেশসঞ্চয়ং সন্নিগৃহ্য তিমিরং মরীচিভিঃ।
কুট্মলীকৃতসরোজলোচনং চুম্বতীব রজনীমুখং শশী॥ ৬৩॥

ঐ হেরো চাঁদ মোহন উজল কিরণাঙ্গুলি দিয়া
রজনী-প্রিয়ার কালো কেশ পাশ ধরিছে সোহাগভরে,
মুখচুম্বন করিছে তাহার নিকটে টানিয়া নিয়া
মুদিয়া আসিছে নিশার কমল-আঁখিদুটি সেই তরে।

মিলনের রাত্রি বড়োই ক্ষণস্থায়িনী। প্রেম-লীলার পর রাত্রি প্রভাত হোলো। স্বর্ণপদ্ম ফুটলো, চন্দ্রশেখরের নিদ্রাভঙ্গ হোলো।

স ব্যবুধ্যত বুধস্তবোচিতঃ শাতকুম্ভকমলাকরৈঃ সমম্।
মূর্চ্ছনাপরিগৃহীতকৈশিকৈঃ কিন্নরৈরুষসি গীতমঙ্গলঃ॥ ৮৫॥

'ঊষাকাল এলো, ধরিল মধুর তান কিন্নর দলে,
কৈশিক রাগ মূর্চ্ছনা দিয়ে গাহিল মধুর স্বরে,
ফুটিয়া উঠিল স্বর্ণপদ্ম প্রভাত-সায়র-জলে,
চন্দ্রশেখর জাগিলেন তবে নিদ্রাভঙ্গ করে।

প্রভাত-সমীরণ পদ্ম গন্ধ নিয়ে এলো হরপার্বতীর কাছে।

তৌ ক্ষণৌ শিথিলিতোপগূহনৌ দম্পতী চলিতমানসোর্ম্ময়ঃ।
পদ্মভেদপিশুনাঃ সিষেবিরে গন্ধমাদন-বনান্তমারুতাঃ॥ ৮৬॥

মানস হইতে পদ্মগন্ধবাহী মৃদু সমীরণ,
পরশিল হরপার্ব্বতী দোঁহে বাঁধা ভুজবন্ধনে,
শিথিল হইল ভুজবন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন,
গন্ধমাদন বনের সমীর সেবিলেন দুইজনে।